নীহারিকা

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ পত্রিকা

২০২৪-২০২৫

চর্তুদশতম সংখ্যা

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

যোগীবটতলা, বারুইপুর, কোলকাতা -১৪৫

উৎসর্গ

নীহারিকা" ২০২৫ সালের সংখ্যাটি ন্যাক পিয়ার টিম এর সম্মানীয় সদস্যগণের করকমলে উৎসর্গীকৃত হল।

Dedication

This issue of the college's annual magazine "Niharika" of 2025, is dedicated to the lotus- like hands of the Hon'ble Members of the NAAC Peer Team.

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মো: রওশন আলি মহাশয়

কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের একাংশ

ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ

কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ২০২৪

সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২০২৪

ন্যাক সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবির

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ কনসোর্টিয়াম প্রোগ্রাম

কলেজের দেওয়াল পত্রিকা

ছাত্রীদের হস্তশিল্প

কলেজের পত্রিকা বিভাগ

সম্পাদক - অধ্যক্ষ ড: নুরুল হক

সহকারী সম্পাদক - অধ্যাপক : আজমিরা খাতুন

শায়েরা বেগম

মাতিন আহমেদ

সেখ আসগার আলি

আব্দুল আলি খান

দিলীপ কুমার হালদার

ফারহিন মণ্ডল

তাজউদ্দিন আহমেদ

আসাদুল্লা খান

কবিতা

অনুগল্প

বড় গল্প

প্রবন্ধ

বিশেষ রচনা

ভ্রমণ কাহিনি

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

Contemporary Relevance of Tagore's Concept of an Ideal India in his essay " King and the Subjects "
Dr. Nurul Haque(Principal, Al Ameen Memorial Minority College)

বসু পরিবার ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র-
অধ্যাপক আব্দুল আলি খান (বাংলা বিভাগ)

কবিতা

The Stage We Share- Prof. Matin Ahmed (Department of English)
মনীষা- অধ্যাপিকা শায়েরা বেগম (বাংলা বিভাগ)
নববর্ষ ২০২৫ - আনিস উদ্দিন মোল্লা (শিক্ষা কর্মী)
২০২৪ - বেনজির খাতুন (শিক্ষা কর্মী)
একটি রাতের নির্জনতা ও আমি- সুলতানা খাতুন। (বাংলা)
নন্দিনী- অধ্যাপক আব্দুল আলি খান (বাংলা বিভাগ)
– رثاء الموت صديقة العزيز حافظ ماهر حق
অধ্যাপক শেখ আসগার আলি (আরবি বিভাগ)
Wings
The red string- Prof. Farhin Mondal (English)
রুটিন- অধ্যাপিকা সবনাম খান (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)
Self-Purification-Tanuja Khatun (English)
আল্লামা ইকবাল- ফারিদা খাতুন (শিক্ষা কর্মী)
শৈশব- সানজিদা পারভিন (ইতিহাস)
Whispers of Childhood- Minhaz Uddin Paik (English)
ঘরফেরা- তোফাজ্জল হোসেন (আরবি)
শিল্প- আলিসা লস্কর (ইংরেজি)
অন্বেষণ- রবিউল মোল্লা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)
নিখোঁজ- সহিদুল মোল্লা (আরবি)
ছুটি- সামসুন্নাহার সুলতানা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
সেদিন- রসনি খাতুন (ইসলামিক ইতিহাস)
কথা দিয়েছিলে- নাফিসা খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
খোকনের স্বপ্ন- তাবাসুম খাতুন (শিক্ষা বিজ্ঞান)
জটিল উত্তর- রুবিনা পেয়াদা (ইসলামিক ইতিহাস)
কবি- আনিসা খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
বন্দী বিনিময়- মাম্পি খাতুন (শিক্ষা বিজ্ঞান)
تاج محل - মাসুদুর রহমান (আরবি)
منارة قطب قطب منار- আব্দুল হালিম (আরবি)
অচেনা প্রেমের ছায়া- রিকিতা সরদার (ইংরাজি)

অনুগল্প

পোষ্যদের সমাহার- অধ্যাপিকা রাইসা রহমান (বাংলা বিভাগ)
সীমানা ছাড়িয়ে- ফতেমা খাতুন (বাংলা)
বিদায় বেলায়-আফরিনা খাতুন (বাংলা)

বড় গল্প

ধুলো - অধ্যাপিকা আজমিরা খাতুন (বাংলা বিভাগ)

প্রবন্ধ

Sonnet as a Timeless Literary Genre: A Journey through Centuries- Rohit Ali Molla (English)
ছৌনাচ ও দু এক কথা- রিয়া সেখ (শিক্ষা বিজ্ঞান)

বিশেষ রচনা

মহান বিপ্লবী শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত- নেহা খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
বিপ্লবী কবি- সুহানা খাতুন (ইতিহাস)
তুলসী পাতার ঔষধি গুণ- সিমরান খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট- পারুলি খাতুন (ইতিহাস)
আমাজন- রহিনা খাতুন (বাংলা)
ঘুটিয়ারী শরীফের ১৭ই শ্রাবণের ইতিহাস- বিলকিস পারভিন (বাংলা)
"চা"-উৎপাদনের ইতিহাস- মিয়াসবিন খাতুন (বাংলা)
ধর্ম, রাজনীতি ও বিজ্ঞান :একটি সুষম সমাজ গঠনের জন্য- মিরাজ আহমেদ সরদার (বাংলা)

ভ্রমণ কাহিনি

সুন্দরবনের ভ্রমন বৃত্তান্ত- অধ্যাপিকা নাসিফা লস্কর (ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)
বেঙ্গালুরুর ভ্রমণ- বর্ণালী প্রামাণিক (বাংলা)

সম্পাদকের কলম

কলেজ পত্রিকা 'নীহারিকা'র পথ চলা শুরু ২০০৯- ১০ শিক্ষাবর্ষে। তারপর প্রতি বছর পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। আমাদের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ তাদের স্বরচিত মূল্যবান লেখনি দিয়ে উত্তরোত্তর কলেজ নীহারিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদিও মাঝে কয়েকটি বছর করোনা মহামারীর অভিঘাতের জন্য পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

বিশ্ব যখন আবার তার স্বাভাবিক গতি ছন্দ ফিরে পেয়েছে, আমরা নিজেদের ছন্দ ফিরে পেয়েছি।পত্রিকা কমিটি আবার প্রতি বছর পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এ বছর অর্থাৎ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ' নীহারিকা ' তার চর্তুদশতম সংখ্যার স্মারক।

আমরা যুগপৎ আনন্দিত যে, এ বছর পত্রিকার কলেবর ও গুণগত মান আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এ বছরেই আমাদের কলেজে মাননীয় 'ন্যাক পিয়ার টিম' পরিদর্শন করতে আসছেন আগামী ২৩শে এবং ২৪শে জানুয়ারী। আমাদের কলেজের জন্য এটি একটি মাইলফলক এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রথম আমাদের কলেজে সম্মানীয় ন্যাক প্রতিনিধিগন পরিদর্শন করবেন।

সে কারনে কলেজের পরিচালন সমিতি, IQAC এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের সিদ্ধান্তক্রমে আমরা " নীহারিকা '১৪" সংখ্যাটি সম্মানীয় ন্যাক পিয়ার টিম - এর করকমলে উৎসর্গ করেছি। এবং আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, পত্রিকার উন্মোচন হবে আগামী ২৩ শে জানুয়ারী, ২০২৫। আমরা মাননীয় ন্যাক পিয়ার টিমের সম্মানীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগনকে সবিনয়ে অনুরোধ করতে চাই, পত্রিকাটির উন্মোচন ও প্রকাশের জন্য।

২৩ জানুয়ারী দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু'র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল আলি খান একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছে, যা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া আরও অনেকে তাদের সুন্দর ও উন্নতমানের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ,ভ্রমণ কাহিণি ইত্যাদির মাধ্যমে পত্রিকা আকর্ষণীয় করতে সহযোগিতা করেছেন।

আমি পত্রিকা কমিটি এবং যারা পত্রিকা কম্পোজিং, প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সহ সকলকে আন্তরিক ধণ্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, নীহারিকা আগামী দিনে তার প্রকাশ সফলগতিতে অব্যাহত রাখুক - এই প্রার্থনা করি।

ডঃ নুরুল হক
অধ্যক্ষ
আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

১১ ই জানুয়ারী, ২০২৫
বারুইপুর

Contemporary Relevance of Tagore's Concept of an Ideal India in his essay " King and the Subjects "

Dr. Nurul Haque(Principal, Al Ameen Memorial Minority College)

" Ingrej O Bharatbashi " (1893) , one of the essays of Rabindranath Tagore 's " Raja O Praja (King and the Subjects) as rendered by the eminent Professor Jharna Sanyal as " The Englishmen and the Indians " is a seminal essay on British Governance of India and on the relationship between the two people, the ruler and the ruled. It provides within its limits the history of the colonial construction of the racial, social and psychological character of the colonizers and the colonized. It also provides Tagore's changed view of Nationalism where he propounds some fundamental ideas as to how to build the Indian Nationalism on the face of British colonization.

All through this essay, Tagore discusses on the growing resentment of the Indians against the British in an India colonized by the British, their causes of resentment, different roles of the so - called educated Indian ' babus ', and the Anglo - Indians and the remedies that he had suggested for the discovery of the Indians ' souls and their freedom from the crutches of the British rules.

Tagore considered that it is the Englishmen 's indomitable pride that incessantly trode on the chests of the Indians. The ruler (the British) could punish the ruled ones, terrorize them but he could not annihilate the mounting resentment and grudge of the Indians, as elsewhere in "Raja O Rani " (The King and the Queen) Tagore's says, " Weapons can kill the enemies but they always fail to kill their animosity." The kind of scurs that were created in the minds of the Indians because of the ignominious treatments of the Englishmen to them, required to be understood and recovered by the Englishmen by sensing the minds of the Indians, which however, the Englishmen had ever failed. This could be possible provided the Englishmen would have shown some sort of flexibility, which they did not do. They took that the resentment would lie only among their English- knowing clerical classes, not among the common Indians. Consequently, the Englishmen or the British could not properly weigh the pains and agonies of the Indians rather they belittled their agonies. This failure to weigh this issue was supposed to be the root cause of the Indians ' resentment, which Tagore calls, " Eitei Ingrejer dosh- se kichutei ghore asite chayna (The root problem that lies with the Englishmen is that they never intend to enter the house). While on the contrary, the rulers crave for sympathy from the Indians by doing some welfare activates to them. Tagore ridiculed this unhesitatingly and called it as " sowing of huge seeds by the Englishmen but not least irrigating the land " i.e by rendering benefits to them sans love, they expect their gratefulness which is quite impossible to get.

The result being the educated Indians cannot consider the benefits provided by the Englishmen to them as benefits as the Indians failed to be satisfied with the kind of benefits that the Englishmen pay to them with little love, respect and sympathy. Thus the Englishmen became indispensable for the Indians but they failed to realise the indispensability of endearing the Indians. They could not realise the causes of the adverse reactions of the Indians towards the so- called welfare activities done to them, and therefore, took recourse to atrocities that were meted out to the Indians. They didn't least think of compromising with the Indians when they played the roles of the rulers. The British was overwhelmed by his mightiness but was surrounded by his complex and arrogant psychologies.

In India the Englishmen had to deal with two types of subjects - the Anglo Indians and the Indians. The formers were dear to the Englishmen ; therefore, they in spite of being the minorities, got priority in respect of their strength than the Indians. So the Indians were

wounded, were torn by them every now and then. While the Englishmen did not least bother about the dehumanization of the Indians by them, about the conflicts of contradictory interests of Anglo - Indians and the Indians.

Tagore could identify a few reasons as to why the Englishmen would have looked down upon the Indians. The first and foremost reason being, the racial attitudes and apartheid of the Englishmen towards the Indians.The racism emrges from the superstition and obsession of the Englishmen towards the Indians. While the Indians have a natural depth, sublime love and profound affinity of their nature, which go unrecognized by the Englishmen due to their superstitions. The growing number of Anglo - Indians work as impetus for their deliberate distancing from the Indians, and which simultaneously did not give any trouble to rule our larger motherland. The Englishman who for the first time was assigned duty to rule the Indians, even made dirty and ignominious comments about the Indians not even knowing the least about them, and this was also because he was influenced by the Anglo- Indians.

The second important reason is that the so called inferiority of the Indians in comparison to the British debarred them from finding measures to get themselves rid of their insults that they perpetually received from the Englishmen. It is true that one who cannot earn his honour, is not honoured by anybody. In addition to this, the Indians belong to a family system and were therefore to carry responsibilities of their family members including their livelihood, and the Indians had to depend on the employment provided by the Englishmen. So they could not defy their so called British employers.The Englishmen considered these responsibilities of the Indians to their families to be their cowardly nature, which subsequently led them to mete more insults to them. The results being that the Indians had to carry on responsibilities of their larger families together with greater insults.

Thirdly, the British newspapers, their English literatures and stories, travelogues, their histories, geography, political essays and satirical poems had continuously depicted at large the growing distastes of the Englishmen towards the Indians. Their literatures and writings had seldom sympathised with the Indians.One could find from a glance to the criticism of India by Edmund Gross that India was nothing better than a dry, ugly land,while in reality our mother India was thousand times beautiful and something quite opposite to what he had depicted. Tagore had considered that it was their lack of sympathy and affection that turned our beautiful India ugly to them. However, a few writers and poets like Edwin Arnold and Robert Tennyson could find the real beauty of India and therefore they had sympathised towards India and the Indians in their writings and poems.

While describing the obnoxious attitude of the Englishmen to the Indian citizens, Tagore compared the rule of Mohammedans in India with that of the British, and stood on the side of the Mohammedan rulers, saying that the Muslim rule was sympathetic to the Indians. There were much in common between the the Muslim rulers and the Indians ; there were exchanges of thought between the two parties in the matters of philosophy and poetry, in literature and in intellectual exercises. Tagore had recollected here an important poem of the British poet-laureate Tennyson, titled as " The Dreams of Akbar " where the poet praises Akbar's lifelong endeavors to establish love and peace among people of different communities in India, and subsequently Tennyson dreams of the Englishmen to think in the same line and vein in future. But Tagore unfortunately observed that the British policies in politics which were berift of love and fellow- feeling, rather escalated the breach and conflicts between the Hindus and Muslims of India.

Tagore cites a very beautiful simile to make us understand the inner strength and worth of the Indians. As the earth by protecting itself from the attractions of sun gains some outstanding stronger opposite energy, the Indians in confrontation with the Englishmen regain their moribund vitality by delving deep into her ancient smritis and sruties, poetry and myths and history and philosophy and rediscover their treasure. The Englishmen 's indignation had

repulsed the Indians to their own selves consequence of which we had been able to rediscover our ' Indian soul ' and had given us strength to obtain our freedom. Tagore however in this context had expressed strong reproach to those Indians who had resorted to adopt the plausibly beautiful etiquettes and customs, habits and manners of the Englishmen, which they considered to be means to deserve respect from the Englishmen. Tagore considered this as the attempts of some educated Indians to purchase ' meagre respect ' from the Englishmen with the abandonment of national respect.

Tagore suggested of a longstanding way that the Indians must adopt and dreamt of a Gurudev who would prepare himself exceptionally and unnaturally by treading a hitherto untrodden path. This Gurudev would shun all wordy talks and worldly hopes and aspirations and prepare and grow in seclusion like a hermit in deep devotion and meditation - like learning and acquiring of grit,knowledge of sciences and technologies, free businesses, adherence to truth and propagation of it and holding high of his self- respect and dignity and profound understanding of the meaning of being protected in religion (dharme rakkhoti rokkhito) ; thus the Gurudev of Tagore's dream be of efficiency par excellence to lead the Indian nation towards achieving their full freedom and respect.

The British had left India long before. We all are living in a free India for over seven decades . But the colonial mindsets of the rulers, racism, apartheid and parochialism have once again come out with their poisonous teeth and nails, they are now in full swing as prominently evident from the activities of the rulers of our country. The Indian citizens have been divided into fragments in terms of religion, caste, colour and wealth,etc. The SCs, STs and minorities are denied their due rights and respect. They are being perpetually harassed, tortured and even killed in many provinces of India. Therefore, it is high time to hope and dream, as Tagore had dreamt, and to act accordingly to rebuild an India which will be free from the barriers of narrow divisions and will provide equal treatments to all her citizens and make them unified Indians, which are the true foundational elements of an ideal India.

বসু পরিবার ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র

অধ্যাপক আব্দুল আলি খান (বাংলা বিভাগ)

হুসেন শাহের আমলে (১৪৮৯-১৫১৯) গোপীনাথ বসু তার মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। এইভাবে বসু পরিবারের সঙ্গে প্রথম যুক্ত হয়। পরিবারটি আগা গোড়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির রাজনীতি করে গেছেন। স্বাধীনতার শেষ প্রান্তে বসু পরিবারের অন্যতম সদস্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে। কিন্তু তাঁকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাওঃ ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি তাঁকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘরে সিঙ্গাপুর 'আযদ হিন্দ বাহিনী'র নেতৃত্ব দেন নেতাজী। ঐ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন শাহনওয়াজ খাঁর। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু শাহ নওয়াজ খাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন। তিন হাজার সৈনা ছিল ঐ বাহিনীতে। তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দিল্লী জয় করে লালকেল্লায় স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন করা। আমেরিকার সৈন্যদের হাতে জাপান পরাজিত হলে নেতাজীর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সামনে এল ভারত স্বাধীনতা পেলে প্রধানমন্ত্রী কে হবে? তারপর দেখা গেল নেতাজী সুভাষ বসুকে নিয়ে কূটনীতির খেলা। ঘোষণা করা হল নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তার পরের অধ্যায়ে হল দেশ ভাগ। নেতাজী দেশে ফিরে আসতে পারলে দেশ ভাগ হতই না। বাঙালীরা একটা ভাল জায়গায় পৌঁছাত।

গোপীনাথ বসু থেকে সুভাষ চন্দ্র বসু পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার বসু পরিবারটি ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। নেতাজী গবেষক অনুজ ধর নতুন তথ্য সামনে নিয়ে এসে বলেছেন- "১৯৪৯ সালে নেতাজী ছিলেন চীনে", নেতাজীর দাদা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় সেই সময় রিপোর্টও করেছিলেন। "মাও সেতুং এর চীনে রয়েছেন সুভাষ চন্দ্র বসু"- যে রিপোর্ট নাকি ছিল জহরলাল নেহেরুর কাছেও। তবে অনেকে মনে করেন নেতাজী দেশে ফিরতে পারলে ভারত ভাগ হত না, বাংলাও ভাগ হতো না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের পরিকল্পনায় নেতাজীকে হটানো হয়েছিল এবং দেশ ভাগ হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। বসু পরিবার দেশ ভাগের বিরুদ্ধে ছিল।

নেতাজী দক্ষিণ ২৪ পরগণার গর্ব। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুভাষগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর আর্দশ মেনে নিলে ভারত ও বাংলা কখনও ভাগ হত না বলে অনেকের ধারণা। তাঁর আর্দশ ছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য।

The Stage We Share

Prof. Matin Ahmed (Department of English)

To our beloved Principal sir, with respect so true,
For your guidance, we owe this view.

In the quiet hum of a timeless hall,
Where echoes of dreams rise and fall,
We welcome today, with hearts so true,
The NAAC Peer Team, with honour due.

A tapestry of voices we weave,
Moments of pride, where we believe.
This day, a celebration of art and grace,
In your presence, we find our place.

At center stage, Diplina dances,
Her steps unfold a graceful story of life.
Behind her craft, in quiet might,
Selina paints each move in light.
From hand to hand, the vision grows,
A seed of art the world now knows.

And Sania, with a voice so clear,
Anchors our hearts, draws us near.
Words, like rivers, flow in rhyme…

মনীষা

অধ্যাপিকা শায়েরা বেগম (বাংলা বিভাগ)

মনের ঐশ্বর্য নিয়ে বেঁচে আছি সশরীরে;
প্রানের শ্বাসবায়ুকে গ্রহণ করেছি আর তোমাকেও-
নবীন প্রাতে ভোরের সূর্যোদয়ের শেষ আলোটুকুকে ভুলিনি কখনও
সবুজ পাতায় ছড়িয়ে পড়া শিশিরের উপর
কচি-নরম মায়ামেদুর সোনালি রং
মনে আছে কি তোমার ?
স্মরণীয় মনীষা তোমার আর আমার আর এই পৃথিবীর,
এই ঐশ্বর্য এখনও যোগাচ্ছে শ্বাসবায়ু আর জীবনের হাসিকান্না।
জীবনের দাদরাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি আমি,
তাল কাটিনি
মনীষা তুমি সঙ্গে থেকো, উপস্থিতির ভাস্বরতা নিয়ে।
তোমাকে হারানোর চরম মুহূর্তে হারিয়ে ফেলব-
আমার অনুভূতি বিশ্বাস আর আত্মমর্যাদা।
মৃত্যুর হাসিমাখা আলোচ্ছটা গ্রাস করবে আমাকে।

নববর্ষ ২০২৫

আনিস উদ্দিন মোল্লা (শিক্ষা কর্মী)

নববর্ষের দিনগুলি সব আলোয় ভরে উঠুক ।
ছেলে মেয়ের মনের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক ।
নতুন দিনের নতুন শিশু চাঁদের হাসি হাসুক।
ভালোবাসার চুমু দিয়ে স্নেহের দোলায় দুলুক ।
নতুন দিনের খুশির ছোঁয়া প্রাণের ঘরে লাগুক।
ফেলে আসা দিনগুলি সব স্মৃতি হয়ে থাকুক ।

২০২৪

বেনজির খাতুন (শিক্ষা কর্মী

২০২৪তোমার জানাই
শেষ বিদায়ের গান,
দুঃখ মোদের কণ্ঠ বোজা
তাইতো ম্রিয়মান
২০২৪তোমারে জানাই
শেষ বিদায়ের গান।

রাতের বেলায় যাওয়ার সময়
করোনা অভিমান,
ফুলের হাসি হাসো তুমি
হইও নাকো ম্লান।
২০২৪ তোমার জানাই
শেষ বিদায়ের গান।

জানি তোমার বিদায় দিতে
ব্যথা মোদের বুকে লাগে
তাইতো মোরা শোকে মুহ্যমান,
২০২৪ তোমার জানাই শেষ বিদায়ের গান।

২০২৪ জানিয়ে গেল
সুখ দুঃখের কথা, হৃদয় মোদের শূন্য আসন
গভীর ক্ষত,ব্যথা।

মোদীর দেহে
তোমার রক্ত বহমান,
২০২৪ তোমার জানাই
শেষ বিদায়ের গান।

একটি রাতের নির্জনতা ও আমি

সুলতানা খাতুন (বাংলা বিভাগ)

ঘুমের সাথে অভিভূত আজ পৃথিবী
এই নির্জন রাতের চুপিসারি শব্দ;
দুর্বোধ্যতার সীমা লঙ্ঘন করে মত্ত করে আমাকে।
নিশীথের মায়াবী সুন্দরীর গোপনবার্তা
অজ্ঞাত ডাকছানি দেয় কাকে!
গাছের পাতার উপর ছড়িয়ে পড়া
ওই ল্যাম্পপোস্টের কৃত্রিম আলো জাগায় অন্তরে অসাধারণত্ব।
আজ আবার বৃষ্টি হয়েছে।
তাই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জীবনের তারুণ্যে ভরা-
মনের কচি পাতাগুলি।
রাতের কলকাতার বহুবিচিত্র আওয়াজ-
মুখরিত করতে চায় নিবিড়- তমসাকে।
আজ রাতে মগ্ন হয়েছি নির্জনতার সাথে।

নন্দিনী

অধ্যাপক আব্দুল আলি খান (বাংলা বিভাগ)

নন্দিনী আসলে কার?
সে কি রাজার, বিশুপাগলের, না রঞ্জনের ?
নাকি সে একাই নিজের পরিপূরক!
কোন দিন কোন পুরুষের প্রয়োজন কি ছিল তার?
নাকি অপ্রয়োজনেই কাটিয়ে ফেলা জীবনের কিছু সময়?
সে কি রাজাকে খুশি করতে চেয়েছিল?
চেয়েছিল কি শুনতে শুধুই বিশুপাগলের গান?
রঞ্জনের হাত ধরে যে নন্দিনীর পথচলা সে আজ কোথায় গেল হারিয়ে?
রাজা কিম্বা বিশুপাগলের কথা জানিনা।
'নন্দিনী'
রঞ্জনকে কোনদিন ভুলতে পারেনি।
তাই আজও কেঁদে চলে নন্দিনীরা হারিয়ে যাওয়া শোকের ভিতরে।

رثاء لموت صديقه العزيز حافظ ماهرحق

Sk Asghar Ali (Department of Arabic)

قاله الشيخ أصغر علي في وداع صديقه الحميم، الإمام المخلص حافظ ماهر حق، الذي كان عالماً بارعا ومثالاً في الإخلاص والتقوى.

كُنَّا مَعًا نَتَقَاسَمُ الْأَفْرَاحَا (١
وَنَسِيرُ دَوْمًا نَتَحَدَّى الْجِرَاحَا
كُنَّا نَعِيشُ بِأَمَلٍ وَسَلَامِ (٢
وَنَرْسُمُ الْبَسْمَةَ رَغْمَ الظَّلَامِ
كُنَّا نَحْلُمُ بِبَقَاءٍ طَوِيلِ (٣
لَكِنَّ أَقْدَارَنَا لَا تَمِيلِ
قُلْنَا سَنَبْقَى مَعًا لِلْأَبَدِ (٤
لَكِنَّ فُرْقَتَنَا قَدْ سَبَقَتِ الْوَعْدِ
لَمْ نُدْرِكْ أَنَّ الْحَيَاةَ سَرِيعَةٌ (٥
وَأَنَّ لِقَاءَ الْأَحِبَّةِ دَقِيقَةٌ
جَاءَ الْقَضَاءُ فَأَطَاحَ الْأَمَانِي (٦
وَأَبْقَى الْقَلْبَ حَزِينًا يُعَانِي
يَا رَبِّ، فَارْحَمْ حَبِيبًا فَانِي (٧
وَاجْعَلْ لَنَا لِقَاءً فِي الْجِنَانِ

أَبْيَاتُ الدُّعَاءِ وَالْخِتَامِ:

يَا رَبِّ، اجْعَلْ فِي الْفِرْدَوْسِ نُزُلَهْ (٨
مَعَ النَّبِيِّ وَصَحْبٍ قَدْ سَبَقُوا أَهْلَهْ
وَاغْفِرْ لَنَا ذَنْبَنَا وَالذُّنُوبِ (٩
فَأَنْتَ غَافِرُ الذَّنْبِ لِلْعَاصِي التَّائِبِ
وَارْحَمْنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَحْدَنَا (١٠
فَأَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ سَنَدُنَا
يَا رَبِّ، اجْعَلْ حَبِيبِي فِي نَعِيمٍ (١١
وَاجْمَعْنَا بِهِ فِي جَنَّاتِ مُقِيمٍ
ذِكْرَاهُ بَاقِيَةٌ فِي كُلِّ حِينٍ (١٢
تَسْرِي بِقَلْبِي كَنَبْضٍ دَفِينٍ
مَهْمَا قَضَى اللَّهُ فَهُوَ حَكِيمُ (١٣
لَكِنَّ قَلْبِي بِحُزْنِي عَلِيلُ
فَارْفَعْ لَنَا بِالدُّعَاءِ الْمَقَامَا (١٤
وَامْنَحْنَا صَبْرًا عَلَى مَا أَلَمَّا
يَا رَبِّ، اجْمَعْنَا مَعَ مَنْ نُحِبُّ (١٠
حَيْثُ السَّلَامُ، وَحَيْثُ الْقَلْبُ يَطِيبُ

Wings
The red string

Prof. Farhin Mondal

The lies piled up like stubborn walls
Round the imprisoned truth I held.
Laughter cried from beyond the bars,
Wondering where it failed.
The hand I held,
The eyes I saw,
Now floated in the misty snow
As mirages adorned the road.
The steps that were meant to be taken in pride,
Are taken in shame and sorrow.
The tight little bond
With the right amount of promises
Got loosened with the beat of time,
The stranded strings lay bare
And strangled the love I cared.

(Published under the name Mira, in Writer's Cafe, an online poetry publishing platform)

রুটিন

অধ্যাপিকা সবনাম খান (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)

সকালে উঠিয়া আমি মনের খেয়ালে
সব কিছু শুরু করি রুটিনের তালে।
গ্যজ গ্যজে মন তবু কাজ করে যাই
সারা দিনে সব কাজ সেরে ফেলা চাই।
খাওয়ার টেবিলে বসে শুধু খাই খাই খাই
মায়ের রান্নাতে ত্রুটি কোন নাই।
ফোলা ফোলা লুচি আর মোগলাইয়ের ধুম
ভুড়িতে কোপ্তা কারি চোখে আসে ঘুম।
মন চাই সেরে ফেলি চোখ বলে থাক
বাকিটুকু কাল হবে আজ চলে যাক।
টান টান চোখ নিয়ে কাজে লেগে যাই
কাল কাল না করিয়া সেরে ফেলি তাই।
সমাধানের পথ পেতে মনের জোর চায়
তাই বলি কাল ক্ষেপ করিওনা ভাই।

Self-Purification

Tanuja Khatun (English)

In the quiet corners of the soul,
Where shadows linger, dark and whole,
A flame ignites, both soft and bright,
To cleanse the heart and give it light.

O whispering winds, remove my pride,
Let falsehoods wither, fall aside.
Like rivers flow to meet the sea,
May truth alone remain in me.

The weight of anger, greed, and fear,
I cast away, to draw you near.
With every breath, a prayer, a plea,
To rise anew, serene and free.

So wash me, Light, with love's pure rain,
Let ego break, let peace remain.
Through silence deep and thoughts refined,
I'll find the self once redefined.

আল্লামা ইকবাল

ফারিদা খাতুন (শিক্ষা কর্মী

হৃদয়ের এলবামে তুমি
বাধা রবে চিরকাল ।
প্রিয় কবি মোর
আল্লামা ইকবাল ।
তোমার কবিতা গোলাপ হয়ে।
ফুটে থাকুক মোর জীবনের বাগানে।
ভাব ভাষা আর ছন্দ হৃদয়েতে ঢেউ আনে।

শৈশব

সানজিদা পারভিন(ইতিহাস)

শৈশব মানে বাবার কোলে
বাজার দোকান ঘোরা।
শৈশব মানে দাদার কাছে
হাজার গল্প করা।

শৈশব মানে
স্কুল শেষে অটো ধরার লাইন।
ভোর চারটায় মোরগ ডাকা
ভোরে পড়তে বসার আইন।

শৈশব মানে হাজার স্মৃতি
মনের পথে হাটে।
শৈশবের চৈত্র সেল
কাছারি বাজারে কাটে।

শৈশব এখন বদলে গেছে
সময় এর ব্যবধানে।
এখন সবার শৈশব কাটে মোবাইলের স্কিনে।

Whispers of Childhood

Minhaz Uddin Paik(English)

Beneath the shade of the old mango tree,
We chased the winds, wild and free.
Laughter echoed, so pure, so bright,
Days slipped gently into night.

Tiny feet on dusty roads,
Climbing dreams in secret codes.
Marbles, kites, and paper boats,
Whispers hid in childhood notes.

The world was small, yet skies were wide,
No fear to hold, no need to hide.
A bruised knee or a fallen kite,
Were mended fast with hugs so tight.

Oh, the scent of rain on summer's earth,
The magic of stories near the hearth.
Those golden days, now memories sweet,
Where innocence and wonder meet.

If time could pause, just one more while,
I'd return again to that carefree smile.
For childhood lives in hearts so deep,
A treasure we promise forever to keep.

ঘরফেরা

তোফাজ্জল হোসেন (আরবি)

আলোর পিছনে আঁধারি ছায়া অবিরাম হাঁটছে
কেউ থামছে না
দিন-রাত, নিদ্রা জাগরণ ক্রমান্বয়ে
নাগাড়ে জেগে থাকলে ঘুম নামে চোখের পাতায়
ঘুমের অতলে তলিয়ে থাকতে থাকতে ভেসে উঠি
চলতে চলতে থামি বলতে বলতে তাই
সময়ের পাল্লায় মেপে চলি জীবন
ঘ্রাণের মধ্যে খুঁজি বাঁচার ইন্ধন
প্রাণবন্ত উজ্জ্বল মুখ আহ্বান করে
ধুতরার মধু খেয়ে সুখ পেতে চাই
রাতের শ্মশানে শিব পাশ ফেরেন ডানে বামে
মৃদু হাসি লেগে থাকে ত্রিকালের মুখে
সৃষ্টি বিনাশের ডমরু বেজে ওঠে
আঁধার হাত ধরে পৌঁছে দেয় বাড়ির দরজায়
কড়া নেড়ে প্রতীক্ষা করি, কখন খুলে যাবে দ্বার।

শিল্প

আলিসা লাস্কার (ইংরাজি)

প্রতি যুক্তাক্ষরে একটা দুঃখ অবশিষ্ট থাকে
সোজা উল্টোর সম্ভ্রান্ত সোয়েটারেও
সাদাটে কিছু শ্রম
নিখুঁত কিছু সুখ নীলছবির স্বাভাবিক দেওয়ালে
ওদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় একটা নদী
দুকূল ছাপিয়ে বুনে চলে
শব্দ ও শস্য
সম্মানজনক দূরত্বে স্বপ্ন গর্ভবতী হয়।

অন্বেষণ

রবিউল মোল্লা (ইসলামিক ইতিহাস)

কোথায় খুঁজি তোমায়?
আকাশের নীলিমা নেই, নেই ঝলমলে সোনালী রোদ
নেই উজ্জ্বল সাদা মেঘের আনাগোনার ব্যস্ততা,
নেই সাতরঙা-রং খেলার মন-মাতানো তরঙ্গ-
তোমাকে খুঁজবো কোথায়?

নিস্তরঙ্গ নদীতে জলের উচ্ছ্বাস নেই
ভারাক্রান্ত দীর্ণ-বিদীর্ণ তরণীর
হাড়ভাঙা পারাপার

পালে হাওয়া লাগিয়ে তরতরিয়ে যাওয়া
তার স্বপ্নেও আসে না।
তুমি আছো নাকি এদিক-সেদিক কোনো বাঁকে?
পাহাড়ী পথে অরণ্য শোভা নয়, ঝর্না নয়,
রুক্ষ কঠিন উত্তরণ-অবরোহন
নিতান্তই প্রয়োজনে। দু'চোখের পাতায় কষ্টের ঘুম যখন নামে
তখনও অনেক ছায়া ছায়া সমস্যা,
কত কঠিন কঠিন সংগ্রাম

শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে।
তোমায় খুঁজে পাওয়া হলো না।
তুমি কি কাছাকাছি ছিলে?

নিখোঁজ

সহিদুল মোল্লা (আরবি)

মেয়েটির কোনো খোঁজ নেই
দামি হিরের কাঁটা লাগানো কঠিন
জমির উর্বরতা ক্রমশ কমছে
ফসল ফলাতে সার ছাড়া উপায় নেই
ভ্যালেনটাইন ডের উষ্ণতা আর বাড়ছে না
লেপ কম্বলে এখনও রাত কাটে
পৌষ মেলায় ভুবনডাঙার মাঠ কনকনে শীত সমগ্র বিছানা জুড়ে

দূষণ নাকি দংশনে সে কাবু
শরীর জুড়ে পলাশ রাঙা আগুন বেগুন গাছে টুনটুনির বাসা
বেড়াল মাসির হাপিত্যেশ উপোষ।

ছুটি

সামসুন্নাহার সুলতানা (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

ক্লান্ত নাবিক তুফান ভারী মানুষের কাছে কোনোদিন কিছু চাওনি
তবু কেন ছুটি চেয়েছ তুমি
অনুভব করেছি আমি
একটি শর্তে দিতে পারি
কোনদিনও তুমি আর
দিতে পারবে না গোলাপের কুঁড়ি
যেদিন ঝরে যাবে একটি একটি পাপড়ি
সেদিন ঝরে যাব আমি
সেদিন সত্যি ছুটি পাবে তুমি এই ঘর, এই বাড়ি ধু ধু প্রান্তর, হাহুতাশ
পাহারা দেবে তুমি।

সেদিন

রসনি খাতুন (ইসলামিক ইতিহাস)

তুমি কি জানো এই প্রিয় সময়ে
মাইল মাইল শূন্যতার থেকে খসে পড়ছে
দু একটি শব্দগ্রন্থি

কাশফুল, জ্যোৎস্নার বালুচর, যাওয়ার সময় যেখানে ছিল রৌদ্রদগ্ধ
প্রান্তর, সেখানে এখন তারার আকাশ।

ছায়াসঙ্গী তোমাকে নীলদুর্গ ছুঁয়ে যেতে দেখি।

সম্পৃক্ত বাসনাসমূহ নির্ভার সবুজ পাতায়, জ্বলে
পুড়ে যায় মায়াময় ক্রোধে
শস্যের প্রতিভাস, দুলে ওঠে বিহঙ্গী
শরীর গোপনমূল; আলো কি আকাঙ্ক্ষা হবে আজ?

ফেরার সময় তাই বসন্ত দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের দুয়ারে
কীট কীটানু থেকে ধূলো হয়ে যাওয়া শব্দের ভিতরে।

কথা দিয়েছিলে

নাফিসা খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

সাগরের ধ্যানে বৈশাখী নদী, বাঁকে বাঁকে চলে বয়ে।
পাড়ে পাড়ে সে মরালী গামিনী,
প্রেমের কথাটি কয়ে।
মৌসুমী যদি ফোঁটায় ফোঁটাতে,
বুকটি ভরাট করে,
হয়ে বর্ষাতে আবার যুবতী,
দেবে সে দু-হাত ভ'রে।
পাহাড়ের বুকে ঝর্ণারা বলে, মনে আশা আছে থেমে,
যদি হই নদী বৃষ্টির ঢলে, পৃথিবী ভরিব প্রেমে।
দু-কূল ছাপায়ে আনিব বন্যা দেব সার মাটি পলি,
চাঁদের হাট মাটিতে বসাব
কুসুমের বুকে অলি।

খোকনের স্বপ্ন

তাবাসুম খাতুন (শিক্ষা বিজ্ঞান)

খোকন গেল কাজ করতে টেম্স নদীর কূলে-
অনেকগুলো পাস করেছে, কলেজে, ইস্কুলে,
কখনো সে হয়নি সেকেন্ড, তাই তো চিচিং ফাঁক,
খোকন এখন মাসের শেষে পাচ্ছে বারো লাখ।

মায়ের শুধু মন মানে না, দু-চোখ জুড়ে জল,
একলা এ ঘর, একলা জীবন-খোকনই সম্বল।
খোকন খোকন করে মায়, খোকন গেল কাদের নায়,
কান্না মায়ের বুক ভাসায়, খোকনরে তুই ঘরে আয়।

খোকন গেছে কাজ করতে টেম্স নদীর কূলে-
জননী আর জন্মভূমি-দুটোই গেছে ভুলে।

জটিল উত্তর

রুবিনা পেয়াদা (ইসলামিক ইতিহাস)

আমি বুঝি এক স্থানে ঘুরপাক খাই,
সেই স্থান নিজস্ব জ্ঞান ও বিশ্বাস,
সাত সাগরের আশ্বাস পাই কোনোক্ষণে যখন
বাতাসে ইথারের যোগ।

আমার এ গণ্ডীর সীমানা তো বাড়ানোই যায়
যেমন সমস্ত সচেতন অচেতন সচেতনে অচেতনে বাড়ায়।
অর্থাৎ আমি তো ভেবেছি দুষ্প্রাপ্য বর্ধনকারক চাই,
দুষ্প্রাপ্য বর্ধনকারকও চাই।

কিন্তু 'কেন চাই?' এই প্রশ্নের আদি খুঁজে পাওয়া যায়,
অন্ত খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ ও প্রেরণা
অতল অন্ধকারে।

কবি

আনিসা খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

কবিতা তুমি অনুভব,
বিদগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ।
জীবনের প্রতিটি আস্বাদ -কবিতার সার।
ওগো কবি! তোমার জ্বলন্ত মন
তোমার ওজস্বিতা লেখায় হয়েছে প্রকাশ।
তাই তুমি কবি।
আমি রোজই ভাবি ভরিয়ে দেব
সাহিত্যের ডালি কিন্তু অপরাগ
সেটা তো কেবল তোমারকাজ।

বন্দী বিনিময়

মাম্পি খাতুন (শিক্ষা বিজ্ঞান)

তোমার গোপন সিন্দুকে গচ্ছিত রেখেছো যাকে
আমার সে ধন ফিরিয়ে দাও,
তুমিও মুক্ত হও, নাও খুলে দিলাম
রুদ্ধ কারা-দ্বার।
পুঞ্জীভূত ক্লান্তি ক্লেদ-কালো সব মুছে যাক্
সংশয়ী মানব-আত্মার।

বিশ্বের এই দুর্দিনে আজ
রক্তপাত বড়ো অর্থহীন,

যুদ্ধ নয়, শুদ্ধতায় এসো
যতটুকু পারি শুধি ঋণ
এই পৃথিবীর।

সম্পর্কের শুরু হোক সহজ-সুন্দর এসো করি বন্দী বিনিময়,
বিদ্বেষের বাজ নয়, শ্বেত পারাবত
উড়ে যাক্ বিশ্বাকাশে মহানন্দময়--

تاج محل

মাসুদুর রহমান (আরবি)

يُنظر إلى تاج محل على أنه أحد أشهر المعالم الأثرية في الهند بسبب ضريحه الرخامي الأبيض المدمج مع هيكل معقد. تأسست في أغرا، أوتار براديش ، الواقعة بالقرب من ضفاف نهر يامونا ، ويمكن الوصول إلى الجذر. قبل الإشادة بالجمال المطلق ، دعنا نستكشف القصة وراء إنشائه. خلقت سلالة المغول العديد من المقابر الرخامية ، لكن تاج محل هو مثال للجمال المطلق. تم تطويره من قبل الإمبراطور المغولي شاه جهان (1592 - 1666) تخليداً لذكرى زوجته المحبة ممتاز محل (1593-1631) - ولهذا السبب يتكون تاج محل من مقابر.

إنه أكثر من مجرد ضريح لأن الشاعر المعروف شري رابندرانات طاغور وصفه بأنه "دمعة على خد الخلود". تعبير عن تكريم العبقرية المعمارية! يحتوي تاج محل على نوافير وحدائق استثنائية وبوابة الزينة الكبيرة الرائعة التي نُقِشت عليها النقوش الرباعية بخط النص الخطي.

للوصول إلى تاج محل ، يمكن للمرء أن يحجز الرحلات الجوية أو يأتي من خلال خدمات القطارات والطرق في راحته لأنه يبعد 200 كيلومتر فقط عن دلهي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أفضل طريقة للسفر والاستكشاف والاستمتاع بجمال تاج محل الخلاب هي من أكتوبر إلى فبراير في الخريف أو الشتاء أو الربيع.

منارة قطب/ قطب منار

আব্দুল হালিম (আরবি)

قطب منار ، القمة التي يبلغ
ارتفاعها 14.32 مترًا ، هي تكرار رمزي لمئذنة جام في أفغانستان وتصميماتها المعقدة. تم إنشاء
هذا النصب البارز في عام 1192 من قبل قطب الدين أيباك ، وفي السيناريو الحالي ، يعد جزءًا
ثمينًا من مجتمع مواقع التراث العالمي. النصب محاط بحديقة خضراء مشذبة والتي تعتبر وجهة
مثالية للمصورين لالتقاط الجمال الأيقوني للمكان. يتم تنظيم مهرجان قطب الشهير في نوفمبر
وديسمبر ، حيث يجتمع السياح والسكان المحليون للاعتزاز بالرسم والفعاليات الثقافية والموسيقية.
قطب مينار ، المكون من خمسة طوابق ، هو الوجهة السياحية الأكثر حسماً في الهند بسبب أسلوبه
.الأرقى والأكثر ثراءً. علاوة على ذلك ، لا يزال في حالة جيدة
إذا كنت قد أنشأت خططًا لمشاهدة والاستمتاع بالجمال الفخم لهذه الآثار في الهند ، فتأكد من
زيارتك بين الساعة 6:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً. يقع بالقرب من محطة قطب مينار ، ورسوم
.الدخول للمواطنين الهنود 10 روبية ، وللأجانب 250 روبية

অচেনা প্রেমের ছায়া

রিকিতা সরদার (ইংরাজি)

শহর ছেড়ে এক গ্রামে থাকা,
নির্জন রাতে একলা পথ হাঁটা ।
পরিবার দূরে, একাকী রাত,
নতুন জায়গায় ছিল কত সংশয় ভাত ।

সন্ধ্যার আঁধারে প্রথম দেখা,
লাল শাড়িতে মেয়েটি ঠাই রাখা ।
অচেনা সে মেয়ে, ভীত তবু স্নিগ্ধ,
পরের দিন ও পেলাম তাকে নির্ঘাত ।

সন্ধ্যার ডাক, রোজ সে আসে,
লাল শাড়িতে যেনো আলোয় ভাসে।
চোখে রহস্য কথায় আরাম,
আস্তে আস্তে মনের কোনে জমে প্রেমের নাম ।

একদিন বললাম, তোমায় চাই,
তোমার সঙ্গে জীবন সাজাই ।
মেয়েটি থমকে, বিস্ময়ে ভরা,
অন্ধকারে পালাল ছায়ায় সরা ।

আমি থাকলাম, সেও চিৎকার,
গ্রামের লোক এল, করল প্রহার,
চোখ খুলে দেখি, অফিসে শুয়ে,
বলল সবাই পড়েছিলে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে ।

মেয়েটি ? কে সে ? নেই তার প্রমাণ,
গ্রামে তার নাম, অচেনা সম্মান।
বছর ঘুরে এল বিয়ের রাত,
বউকে দেখে হারাল স্মৃতির পাত ।

তার মুখ, তার চোখ, সেই লাল শাড়ি,
বছর বারো আগের প্রেমের ধার ফেরারি,
স্বপ্ন না ছায়া। প্রেম, না খেলা ?
অচেনা সেই মেয়ে আজ জীবন মেলা ।

অনুগল্প

পোষ্যদের সমাহার

অধ্যাপিকা রাইসা রহমান (বাংলা বিভাগ)

আজ ও ভুলু এসেছিল । এই তো কয়েকদিন হল, ওর এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়েছে। আর এসে থেকেই দেখি ওর আমার কিট্টিদের সাথে বেশ একটা সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।একে অপরের মুখের কাছে গিয়ে যেনো কি সব আলাপচারিতায় মত্ত হয়।

এই কিট্টি'র এক বোন বৃষ্টি,এক প্রচণ্ড বর্ষণের রাতে সে আবির্ভূত হয়েছিল এই বিচিত্র ধরনীতে। বেশ বছরখানেক সে আর পাঁচটা বিড়ালের মত স্বাভাবিক ছিল। কোনো একদিন দেখা দিলো রক্তাক্ত পা নিয়ে। একটা পায়ের সব আঙুল কিভাবে কাটা পড়েছে। বেশ অনেকদিন ধরে চললো সেই আঙুলহীন পায়ের সেবা সুশ্রূষা।

কয়েকবছর পর পৃথিবীর মুখ দেখলো কিট্টির মেয়ে শান্তি। এখন শান্তি তার দুই ছেলে নিয়ে শান্তিতে এ বাড়িতে বাস করে, খেলা করে নিশ্চিন্তে। সে আজ প্রায় ছয় বছরের অধিক সময় ধরে ওদের রাজত্ব চলেছে এ বাড়িতে। এই দুই ভাই দুষ্টু আর মিষ্টু।তাদের দুষ্টুমি আর মিষ্টিতা দিয়ে এ বাড়িতে সবসময় একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে রাখে। ওদের একচ্ছত্র একাধিপত্যে কিছুদিন আগে অবধি ও এ বাড়ির ত্রিসীমানায় শুধু কুকুর কেনো, যেকোনো মুরগি-পাখির প্রবেশাধিকারে ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। এদের কাউকে বাড়ির আশেপাশে আসতে দেখলেই গাত্র-লেজ সর্বশরীর ফুলিয়ে সবেগে-সতেজে এগিয়ে যায়। এইভাবে প্রহরীর ভূমিকায় তাদের রাজ্যের সীমানা রক্ষা করে চলেছে এতকাল।

এত সতর্কতার মাঝেও কোথা থেকে বাদামী বর্ণের এক কুকুর ঢুকে পড়েছে বাড়ির একেবারে অন্দরমূলে। প্রথমটায় বিড়াল-গোষ্ঠী কিছু বিচিত্র শব্দের হুঙ্কারে তাকে বিতাড়িত করার ব্যার্থ প্রয়াসে অগ্রসর হয়েছিলো। ভুলু কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এদিকে ওদিকে। বাধ্য হয়ে কিট্টির দল বেজায় মুখ ভার করে অসন্তুষ্ট চিত্তে তাকিয়ে। এখন সেও যে এ বাড়ির সদস্য।

আজ ভুলুকে নিজে হাতে ভাত মাখিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে যে অন্যরকম আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছি তা আরও এক দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পড়িয়ে অথবা পড়ে ফিরছি সেই স্মৃতি আজ অস্পষ্ট। তখন ট্রেন আসার সময় হয়েছে , কিন্তু ২ নং প্ল্যাটফর্মে। স্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে তাই তড়িঘড়ি পা চালিয়ে ওভার ব্রিজ ধরে উঠে পড়েছি।সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েছি। কিছু পরে অনুভব করি এক সাদা-কালো রঙের ক্ষুধিতপ্রায় কুকুর আমার পিছু নিয়েছে। আমার ব্যাগে থাকা কিছু বিস্কুট শুধু তাকে খাওয়াতে পেরেছিলাম মাত্র। কিছু ভয় ভয় যে পেয়েছিলাম, তা সত্য। যদি কামড়ে দেয়। তবে সে দিনটি আমাকে এক তৃপ্তিকর পরিণতির মোড়কে উপহার দিয়েছিল একরাশ ভালো লাগা। যা নিঃসন্দেহে দিনশেষের শ্রেষ্ঠ উপহার। ঠিক যেনো আজিকার মত সে উপলব্ধি, মিলিয়ে দেখে নিলাম হুবহু সে মিলন।

মনে হলো, আজ কয়েকবছর বাদে আমার সেই ভুলুকেই দেখলাম অন্য রঙে।

সীমানা ছাড়িয়ে

ফতেমা খাতুন (বাংলা)

একঘেয়ে ভারাক্রান্ত মন যখন বোরিং ফিল করে , তখন মনের খোরাক যোগানোর জন্য বেরিয়ে পড়তে হয়। মুখে আসি নজরুলের ভাষা "থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে " উপ মণ্ডপ কুয়োর ব্যাঙের মতো বসে থাকলে জীবনে বন্দির বিচার দূরদর্শিতায় করা যায় না। চোখে দেখে জানতে হয় বুঝতে হয়, তবেই তার প্রকাশ হয়। জ্ঞানের কথা ছেড়ে এখন বলি ভ্রমণ আমার জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে। অসীম অজানায় বেরিয়ে পড়াটা আগামীর রসদ হিসেবে মনের উর্বরতা বাড়ায়। ব্যাটারির চার্জারের মত অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। বলতে গেলে আনন্দ দান করে, কর্মেনতুন উদ্যোগ আনে।

গিয়েছিলাম মুকুটমণিপুর। মাসটা সম্ভবত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। সিটটা আমাদের এখানে বেশ ইমেজ ফুল। তবে ওখানকার ঠান্ডা জীবন কাহিল করার ষড়যন্ত্র রচনা করে। যাত্রা শুরু করেছিলাম রাতে। ইচ্ছে ছিল সকাল সকাল পৌঁছানোর। সন্ধ্যাটা কাটে কলকাতাছাড়তে। বিদ্যাসাগর সেতু পার হওয়ার আগে পর্যন্ত কলকাতার পরিবেশ পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল। তারপর অন্ধকার রাস্তা, জনমানবহীন বনবাদাড় আর কুয়াশাচ্ছন্নতা।আমাদের যাত্রা ছিল বাসে। অনেক লোকের ভিড়ে জনের এক এক রকম ব্যস্ততা আর অনুভূতি। বাস ছাড়া কিছুক্ষণ পর সকলেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি অতন্ত্র প্রহরীর মত চোখের পাতা খুলে রেখেছি -যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা যেন কম না পড়ে।দুরন্ত গতিতে বাস এগিয়ে যাচ্ছে। দিনেরবেলাকার যানজট নেই নেই, তাই পথের অপেক্ষা অনেক কম। কোনরকম ট্র্যাফিক জ্যাম ছাড়াই বাস এগিয়ে চলছিল গন্তব্যের দিকে। মনে প্রবল উদ্বিগ্নতা আর অপেক্ষা পাহাড় দেখার। দেখতে দেখতে মাঝ রাতে একটি ধাবাতে এসে গাড়ি থামল। সকলেই দলে দলে নেমে পড়েছে প্রয়োজনীয় কর্মসারতে।চায়ের দোকানে ভিড়। শীতের রাতেও দুটো পয়সার আশায় দোকানীজেগে আছে। শীতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। তবুও শীত একেবারেই যেন কাবু করে দিয়েছে। গায়ে মোটা জ্যাকেট, সুটেট বুটেট কিছু যেন মানছে না। বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে কে যেন গায়ে ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। তাই বেশিক্ষণ বাইরে না থেকে গিয়ে বসলাম বাসের মধ্যে। এই ধাবাতে অনেকগুলো বাস একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই নাকি একসাথেই গাড়ি ছাড়ার অপেক্ষায়। এখানে শালবনের জঙ্গলে দস্যুর ভয়। প্রায় সময় ছিনতাই হয়। তাই নিয়ম অনুসারে যাত্রীরা অনেকগুলো গাড়ি একত্রিত করে এগিয়ে যায়। মনে পড়ে গেল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কপালকুণ্ডলা"র কথা। যেখানে নৌকারোহীরা পর্তুগিজ দস্যুর ভয়ে একত্রে নৌকাছাড়তো। শুনে মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হল কিন্তু এক ধরনের কৌতূহল জাগলো মনে। পুনরায় বাস ছাড়তে রাতএকটা বেজে গেল। এলো সেই ভয়ংকর জঙ্গল। রাস্তা নয়, ঠিক যেন শাল গাছের গুহা। গাঢ় অন্ধকারকে আরো কঠিন করে তুলেছিল সতর্কতা। সমস্তবাসের হেড লাইট ছিল বন্ধ। তাদের যুক্তি হলো এতে দস্যু রাবোঝেনা বাস না ট্রাক। সেই জঙ্গল পেরাতে গতিশীল বাসের প্রায় আধঘন্টা লেগেছিল। সেই আধঘন্টা সকলের প্রাণ যেন কণ্ঠাগত ছিল।

দিনের আলো ফোটারসাথে সাথে রূপনারায়ণের সৌন্দর্য মন কেড়ে নিতে থাকে। মুখের কথা কেড়ে নেয় নদী। ইচ্ছে করে সকলের থেকে আলাদা হয়ে নদীর সৌন্দর্য দেখতে। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নদীর তীরে সৌন্দর্য কল্পনায়। খাওয়া দাওয়া, নাচ গান আর আনন্দ হল্লোড়েকিভাবে সময় কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। একদিকে পাহাড়ি শোভা আর অন্যদিকে পাহাড়ি আদিবাসী সম্প্রদায়। তাদের দৈহিক গড়ন,নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সত্যিই সম্মানযোগ্য। পাহাড়ের উপরে যাকে দেখলাম, পাহাড়ে প্রান্ত দেশে ও যেন দেখতে পেলাম তাকে। সবাই যেন হুবহু একই রকম দেখতে -পার্থক্য করার মত চোখ আমাদের নেই। আদিবাসী নৃত্য, তাদের গান আর বন্য প্রকৃতি রীতিমত হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল। ফিরে আসার সময় উপস্থিত হলো কিন্তু মন চাইলো না। ইচ্ছে করছিল আজীবন রয়ে যাই এখানে। আরো কিছু সময় কাটুক প্রকৃতির কোলে। তা সম্ভব হলো না -ফিরে আসতে হল। আসার আগে বারবার মনে হয়

এ পথে আমার হবে কি আর আসা
তাইতো আমি পথের দু'ধারে
গোপন রেখে যাই আমার ভালোবাসা।

বিদায় বেলায়

আফরিনা খাতুন (বাংলা)

"আমার যাওয়ার সময় হলো
দাও বিদায় "

সময় নদীর স্রোতে পারের থেকে মাঝ নদীতে, মাঝনদী থেকে মোহনায় মিলিয়ে যাওয়া জীবনের স্বাভাবিক গতি। আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনোরিটি কলেজে ছাত্রী হিসেবে আমি এলাম ২০২০ সালে। সবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে মন নতুন ভাবনা ও নতুন রঙে রাঙ্গা হয়েছিল। বহু উদ্দিপনা, উদ্বিগ্নতা আর পছন্দের ভিড়ে আমি কলেজকে প্রথম পছন্দের জায়গায় রেখে ছিলাম।ভেবেছিলাম এখানেই ভর্তি হব। প্রথম তালিকায় আমার নাম ছিল না। প্রচন্ড ভেঙে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম পড়াশোনা ছেড়ে দেব । কয়েকদিন মন খারাপেই কেটে গেল। তারপর দ্বিতীয় তালিকায় এলো আমার নাম। সেদিন খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।বাংলা অনার্সের ছাত্রী হিসেবে এই কলেজে প্রথম এলাম। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে মন মোহিত হয়েছিল। ইসলামিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি আমি মনেমনে চেয়েছিলাম তার সবই এখানে পেয়ে গেলাম। নিজেই নিজের সিদ্ধান্তকে তাই বাহবা দিতে ইচ্ছে হলো। সেই থেকে শুরু হলো যাত্রা। যেখান থেকে পরিপূর্ণতা পেয়ে আজ আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী।

আনন্দে, উৎসবে, মহাসমারোহে কাটছিল জীবন। ভালো সময় তাড়াতাড়ি চলে যায়। কলেজের দিনগুলিও দুঃখের পলকে চলে গেল। "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না "। সুস্থ, সুষ্ঠ পরিবেশে ইসলামিক পরিমন্ডলে শৃঙ্খলা পরায়নতার সময় চলে গেল। তিনটি বছর অধ্যাপকদের সাহচর্যে, অধ্যক্ষের স্নেহ ও যত্নশীল হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে ছিলাম। সবকিছু ছেড়ে যাওয়ার দিন এসে গেল। শিক্ষাজীবনে অনেকটা এগিয়ে গেলেও মনের দিক থেকে পিছিয়ে গেলাম। এমন পরিবেশ, এমন মানুষজন জনকে ছেড়ে অন্য কোথাও পড়াশুনা করতে হবে। এ বেদনা যেন থেকে থেকেহৃদযে বাজতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" সদ্য পড়েছি,তাই মন বলতে চাইলো "আমারে ফিরায়ে লাহো অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানেতবকোলের ভিতরে।"

আমার কলেজ সেই বসুন্ধরা থেকে কোন অংশে কম নয়। তাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। "তবুও যেতে দিতে হয় "কালের নিয়মে। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি এই ভেবে যে, কিছুই হারায়নি বরং নিয়েছিঅনেক। তার সাথে স্মৃতি একরাশ, ভালোবাসা পাওয়ার প্রয়াস। আরো কিছুদিন যদি থাকতে পারতাম এই মহাবিদ্যালয়ে, নিজেকে ধন্য বলে মনে হত।

বড় গল্প

ধুলো

অধ্যাপিকা আজমিরা খাতুন (বাংলা বিভাগ)

নিজের ভেতরের ছটফটানি আর চেপে রাখতে পারছিল না নাফিজা। বলতে তো হয়ই। আজও তাই বলেই ফেলল, "দাদা, একটু দশটার গ্যালপিংটা ধরিয়ে দেবেন।"

অটো যে চালাচ্ছে সে রাস্তার দিকেই চোখ রেখে বলল, "ক'টা বাজে দিদি?"

"ন'টা আটচল্লিশ।"

"আচ্ছা।চিন্তা করবেন না, বাজারে জ্যাম না হলে পেয়ে যাবেন।"

ব্যস, এটা এমন একটা কথা যার পরে যা খুশি তাই হতে পারে। চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, না কি বাজারে আটকে পড়া নিয়ে চিন্তা করতেই বলা হচ্ছে— সেসব ভাবতে গেলেও আবার চিন্তাই করতে হবে। নাফিজা যেখানে থাকে সেই জায়গাটাকে গ্রামই বলা যায় এখনও। আর এদিকটা মফস্‌সল। স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাতেই লম্বা বাজার। প্রায় সব মফস্‌সলেই যেমন হয়। রাস্তাটার নাম হয় স্টেশন রোড আর সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে ভিড়ভাট্টা লেগেই থাকে। সবজি, মাছ, ফল-ফলারি, দোকানপাট, অটো, টোটো, ভ্যানরিকশা, সাইকেল, মানুষ—সব মিলিয়ে প্যাঁচের ভেতরে প্যাঁচ। যেখান থেকেই দৌড়ে আসা যাক না কেন, ওখানে গিয়েই খোঁড়াতে হয়। তবু নাফিজা আবার বলল, "একটু দেখুন না, না পেলে মহা বিপদে পড়ে যাব। ঠিক সময়ে কলেজে পৌঁছতে না পারলে খুব ঝামেলা হবে। আজ স্টুডেন্টদের পরীক্ষা আছে।"

কলেজে পড়ায় নাফিজা। যতই ভাবে না কেন, আজ বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরোবই, রোজই দেরি হয়ে যায়। ট্রেন ধরার তাড়া এসে যায়। পরীক্ষার কথা বলে অটোকে তাড়া দিল সে। বিছানা ছেড়ে ওঠার পর থেকে মা তাকে তাড়া দেয়। মাঝে মাঝে বাবাও। আর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাকে পায় তাকেই তাড়া দেয়। ট্রেন থেকে নেমে কলেজ বেশি দূর নয়। তবে সেখানে পৌঁছতে গেলেও আবার একটা স্টেশন রোড পেরোতে হয়। বাজারও। পৃথিবীতে এত বাজার কেন কে জানে। স্টেশনের ভিড় গলে বেরিয়ে গিয়ে টোটোয় উঠতে হয়। সেখানেও ঠেলা দিতে থাকে নাফিজা। নেহাত ট্রেনের ড্রাইভারকেও তাড়া দেওয়ার উপায় নেই। পারলে তাও দিত হয়তো।যেন দোষটা বাকি সকলের।

অটো নানারকম কসরত দেখিয়ে পৌঁছেই দিল। দশটা বাজার আগেই নাফিজা যখন অটো থেকে নেমে শাড়ি, কাঁধে ঝোলানো খাতা ভর্তি ব্যাগ সামলে, পা চালিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছল তখন ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্ট ভেসে আসছে।

ডাউন শিয়ালদা-ডায়মন্ডহারবার লোকাল...ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার গাড়ি... তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।তার পরেই আবার—অনুগ্রহ করে শুনবেন... আপ ডায়মন্ডহারবার-শিয়ালদা লোকাল...শিয়ালদা যাওয়ার গাড়ি... দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে...।ঘোষণা শোনানোর সময় অনুগ্রহ চায় কেন বোঝা যায় না। সবাই তো কান খাড়া করে থাকে শোনার জন্যই। ভিড়ে ঠাসা, বাদুড়ঝোলা ট্রেন কখন আসবে আর কীভাবে তাতে উঠে পড়া যাবে। লোকাল ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের এই তো ভবিতব্য। হতে পারে, সেইজন্যই আগে থেকে অনুগ্রহ দিয়ে ব্যাপারটা একটু নরম করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

যাক, স্টেশনে পোঁছে গেছে। এবার ট্রেনটা পেয়ে যাবে। লেট আছে গাড়িটা। তাকে তাড়া দেওয়ার মতো তার মানে কেউ নেই। ভালোই হয়েছে। খানিকটা সময় পেয়ে গেছে নাফিজা। হয়তো তার মতোই আরও অনেকে। তবু তাড়াতাড়িই পা চালাচ্ছিল সে। সামনের দিকের লেডিসে উঠবে। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ শুনতে পেল, পেছন

থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকছে।উফ, এই সময়ে কে আবার? তবু ফিরে দেখতেই হল। একজন নাফিজার দিকেই এগিয়ে আসছে। বছর চারেকের একটা মেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে আসছিল সে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নাফিজা। ভাবছিল,নামটা আমারই কিন্তু এ নিশ্চয়ই আমাকে ডাকেনি।একে কি আমি চিনি?
ভুল ভাঙে। মেয়েটি কাছে এসে সরাসরি তার হাতটা প্রায় জাপটে ধরে বলে, "এই নাফিজা, কী রে! শুনতে পাস না? কতবার তোকে ডাকলাম। দেখেও যেন না দেখার ভান করছিস!ব্যাপার কীরে তোর?"
নাফিজা আমতা আমতা করে বলল, "না,আসলে..."
ওসব আসল টাসল ছাড় । তারপর কেমন আছিস বল? কোথায় যাচ্ছিস?এখন কী করছিস? কতদূর পড়াশোনা করলি? হ্যাঁ রে, বিয়ে করেছিস ? পুরানো কারও সাথে দেখা হয়? মানে যোগাযোগ আছে?"
একগুচ্ছ প্রশ্ন একসঙ্গে, একনিশ্বাসে যেন মুখস্থর মতো বলে গেল। না থামালে আরও না জানি কত প্রশ্ন করত! নাফিজাকে বলতেই হল,"কে আপনি? আমি তো ঠিক চিনলাম না!
সে অনায়াসে হাসি হাসি মুখ করে বলল, "কে আপনি! চিনতে পারছিস না! আমি নাদিরা।"
নাফিজাও খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর সেও হাসি মুখেই বলল,"ও আচ্ছা!
তা,কেমন আছিস?"
"ভালো। তুই?"
"ভালো আছি।"
"কোথায় যাচ্ছিস বললি না তো।"
"কলেজে পড়াই। সেখানেই যাচ্ছি।"
"কলেজে পড়াস! ভাল। তাহলে তো কিছু করতে পেরেছিস। বিয়ে করেছিস?"
"না।" ছোট্ট উত্তরটা দিয়ে কথা ঘোরানোর জন্য নাফিজা মুখ নিচু করে তাকাল তার দিকে যে দুজনের কথা শুনতে শুনতে মুখ উঁচু করে তাকিয়েই রয়েছে।গোলাপি ফ্রক।লালচটি।
"এখানে কোথায়? এটা তোর মেয়ে?"
"হ্যাঁ, এ আমার মেয়ে।ওকে নিয়ে তোদের এখানকার হাসপাতালটায় এসেছিলাম।আর বলিস না, কাল থেকে জ্বর।বাড়িতে ওষুধ ছিল, দিয়েছিলাম। কিন্তু কমছে না! এখানে ডাক্তার দেখল। ওষুধ লিখে দিয়েছে।"
আবার পরপর ঘোষণা শোনা যাচ্ছে—ডাউন শিয়ালদা-ডায়মন্ডহারবার লোকাল...আপ ডায়মন্ডহারবার-শিয়ালদা লোকাল...। তার মধ্যেই নাফিজা বলল, "ও।হ্যাঁ, ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ানোই ভাল। তা কোথায় বিয়ে হয়েছে?বর কী করে?"
"বামনায়।বরের জামাকাপড়ের দোকান আছে।একরকম চলে যায়। আমি তো আর কিছু করতে পারলাম না। ওই কলেজের পড়াশোনাটাই কোনওমতে যা হয়েছিল। তার বেশি তো আর হল না।"
"কেন?"
"দুর! বাড়ি থেকে বলল, ওই যা হয়েছে তাই ঢের। বেশি পড়াশোনা করলে আবার সমান সমান পাত্র পাওয়া যাবে না, লোকের কতরকম কথা ছড়াবে। বিয়েতেই ঠেলে দিল।বিয়ে করলে আর পড়াশোনা হয় না। বর,বাচ্চা,সংসার— সামলাব কখন আর পড়ব কখন! ভেবেছিলাম বি.এডটা করব।হলই না আর।হয়েই বা কী হত বল? চারিদিকে যা অবস্থা! ওসব চাকরিবাকরি আমাদের হবে না। কত ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর আমি, আবার চাকরি ! অসম্ভব ব্যাপার! বেকার টাকা নষ্ট। করলে ভাল করে করতে হয়।"
"তাহলে?"

“আমাদের জীবনে যা ঘটে গেছে, গেছে। এবার মেয়েটাকে ভালো করে মানুষ করতে পারলে হবে।আর কি।”
“ও, আচ্ছা।তো বেশ সুখেই আছিস বলতে হয়।”
“হ্যাঁ, সে আর বলতে!বিয়ের পর সুখ, সে তো স্বপ্ন। যা হয়েছে বিয়ের আগে হয়েছে।এখন দায়িত্ব আর কর্তব্য সামলাতে সামলাতে জীবন শেষ। ঘর থেকে বেরোতে গেলেও হাজার রকমের নিষেধ।বিয়েটা কর, করলে বুঝবি কত জ্বালা।এই আছিস, অনেক ভালো আছিস।পারলে বিয়ে-টিয়ে করিস না। বলে না বিয়ের বন্ধন।সত্যি এক বন্ধনই বটে। মুক্ত জীবন বদ্ধ করা।”
এই পর্যন্ত বলেই হাঁকুপাঁকু করে উঠল নাদিরা। “ওই রে, ওই আমার ট্রেন ঢুকছে। এতদিন বাদে দ্যাখা হল, একটু মন খুলে কথাই বলতে পারলাম না।তুই কোন দিকে? আপের দিকে না কি?তাহলে তোর ট্রেনও তো এবার এসে যাবে।এক কাজ কর, তোর ফোন নম্বরটা চট করে দে। মাঝে মাঝে ফোন করব।পুরানো কারও সাথে তেমন যোগাযোগ নেই,দেখাও হয় না।সেদিন টুয়ার সাথে দেখা হয়েছিল জানিস।আজ তোর সাথে হল। ওই রে, ট্রেনটা তো এসেই পড়ল! ধরতে না পারলে ফিরতে কত যে দেরি হয়ে যাবে। এই, আয় আয়...।”
বলতে বলতে নাদিরা মেয়ের হাত টানতে টানতে দৌড়ে গেল। তারমধ্যেই চেঁচিয়ে বলল, “নাফিজা, ভালো থাকিস রে। আচ্ছা।”
ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল ওরা। তারপরেই আবার দেখতে পেল নাফিজা। ডাউন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নাদিরা তার মেয়ের হাত ধরে মেয়েদের কামরায় উঠছে। ট্রেনের ভোঁ বাজল। তারপর প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।ধুলো উড়ে যাচ্ছে ট্রেনের পিছু পিছু।
রেললাইনের বাঁক ধরে মিলিয়ে যাওয়া ট্রেনটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নাফিজা।কে এই নাদিরা? কোথায় থাকে? একে তো সে চেনে না!এর আগে কখনও ওকে দেখেছে বলেই মনে হয় না।এমনকি ও যে পুরোনো কোন বন্ধু টুয়ার কথা বলল, তাকেও জানে না নাফিজা।তবুও ওই নাদিরার হাসিমুখের সামনে নাফিজা বলে উঠতে পারেনি যে সে তাকে চেনে না। ফোন নম্বর নিল না ওই নাদিরা। আর নাফিজারতো চাওয়ার কথাই নয়। তবু যেন সময় কেড়ে নিয়ে চলে গেল চলে যাওয়ার তাড়া।
আপ ট্রেন আসছে। এবার নাফিজাকে যেতে হবে নাদিরার উলটোদিকে। তার মনে হয়, যদি বলতাম আমি ওকে চিনি না তাহলে কষ্ট পেত। কথা বলার ওই প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিটা থেমে যেত। হয়তো বোকা বোকা লাগত ওর। হয়তো অস্বস্তিতে পড়ে যেত। ও চলে যাওয়ার পরেও প্ল্যাটফর্মের এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, যেন ও এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে বকবক করছে।
স্কুলের বন্ধুদের কারও সঙ্গেই দেখা হয় না। অনেকে পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ায়। তারা গ্রামে বাপের বাড়িতে কখন আসে, কখন যায়, জানতেও পারে না নাফিজা। কলেজের বন্ধুরাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে যে যার মতো। ফোনে যোগাযোগ আছে দু-একজনের সঙ্গে। সেটাকে তো আর দেখা হওয়া বলে না। ইউনিভার্সিটির জনাকয়েক ফেসবুকে আছে। তাতে মুখ দেখাদেখি হয়। মুখোমুখি হয় না। তাছাড়া মনে হয়, আগে যা ছিল না, এখন তা-ই হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর ভেতরে কেমন যেন নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা আছে। কে কী করছে — এইসব বলা যাবে না।
আজকের মতোই নাফিজা কতবার অটো ওলাকে বলেছে জোরে চালিয়ে ট্রেন ধরিয়ে দিতে। কোনওদিন হয়ে যায়। কোনওদিন হয়ও না। কিন্তু আজকের দিনটা কেমন আলাদা হয়ে গেল। যেন ওই নাদিরার সঙ্গে আজ দেখা হওয়ারই ছিল।শুধু এই দেখাটা হওয়ার জন্যই যেন নাফিজার ট্রেনটা পাঁচ মিনিট দেরি করল।
ঠিক এই সময়েই নাফিজার মনে হয়,আমি তো ওকে চিনতে পারলাম না। কিন্তু ওকি আমার নামে, আমার মতো দেখতে ওর পরিচিত কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছিল?

প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে দূর থেকেই ট্রেনের ভোঁ। সেই আওয়াজটা যেন ঠেলে নাফিজাকে আরও একটা ভাবনায় নিয়ে চলে গেল। না, নাফিজা যেমন ওই নাদিরাকে চেনে না, নাদিরাও তেমনি কোনোভাবেই চেনে না তাকে। সে একটা নাম ধরে ডেকেছিল। আজ সেটা নাফিজা। আগে হয়তো অন্য কোনও নাম ধরে অন্য কাউকে ডেকেছে। ওই যে টুয়ার কথা বলল। হয়তো সে। সেদিন বোরখার কথা ওঠেনি নিশ্চয়ই। পরে আবার অন্য কেউ হবে। যদি মিলে যায় তাহলে তার সঙ্গেই কথা বলবে ওই নাদিরা। অনর্গল নিজের কথা বলে যাওয়া। বলতেই চায় সে। বলার মতো বন্ধু খোঁজে।

ঝমঝম করে ট্রেন এসে পড়ল প্ল্যাটফর্মের ধুলো উড়িয়ে। নাফিজা জানে, রোজই ধুলো ওড়ে। তারপর থিতিয়ে যায়।

প্রবন্ধ

Sonnet as a Timeless Literary Genre:

A Journey through Centuries.

Rohit Ali Molla

The sonnet, a 14-line poetic form, has held a special place in the world of literature for over seven Centuries.Its enduring popularity is a testament to its adaptability and its ability to encapsulate the complex range of human emotions. This article explores the evolution of the sonnet as a literary genre, tracing its origins, examining its various forms, and discussing it's continued relevance in the modern literary landscape.

A sonnet is a poem of fourteen iambic pentameter lines arranged in a specific rhyme scheme. The sonnet form is originated in Italy in the thirteenth century. The word is derived from the Italian 'Sonetto' meaning 'a little sound'. The sonnet has been an extremely popular throughout English Literary History, even to the modern day.

There are two major patterns of rhyme in sonnets written in the English language:

The Italian Sonnet or Petrarchan Sonnet (named after the fourteenth century Italian poet Petrarch) has two different parts – the 'octave'(first eight lines) and the 'sestet'(the last six lines). The octave usually raises a question or poses a problem ans the sestet serves as an answer or resolution to it. There is a well marked pause between the octave and the sestet, which is known as the 'caesura'. The turn of thought after the caesura is known as the 'volta'. The octave rhymes abba abba ;the sestet rhymes cdecde (or a variant of it, such as cdccdc). Petrarch's sonnets were first invented in England ,both in their stanza form and their subject – the hopes and pains of adoring male lover – by Sir Thomas Wyatt in the early sixteenth century. The petrarchan form was later used,and for a variety of subjects,by Milton, Wordsworth, Christina Rossetti, D.G. Rossetti and other sonneteers, who sometimes made it technically easier in English(which does not have as many rhyming possibilities as Italian) by introducing a new pair of rhymes in the second four lines of the octave.

The sonnet emerged in English literature in the sixteenth century through Thomas Wyatt and his younger contemporary Henry Howard, Earl of Surrey's translation of petrarchan sonnet into English . The early circulation of their sonnets was in manuscripts only.Their sonnets were first published by Richard Tottel in his 'Songes and Sonettes' that is better known as "Tottel's Miscellany" in 1557.The Earl of Surrey and other English experimenters in the sixteenth century also developed a stanza form called the English sonnet,or else the Shakespearean sonnet,after its greatest practitioner.This sonnet falls into three quatrains and a concluding couplet: ababcdcdefef gg. There was a notable variant, the Spenserian Sonnet,in which Spenser linked each quatrain to the next by a continuing rhyme: ababbcbccdcdee .William Shakespeare is widely known as in literary circles as the 'famous playwright of English Literature . He has 37 plays to his credit ; all of them with varied themes and characters. In addition , he has also written three narrative poems and 154 sonnets. The Shakespearean sonnet is divided into three stanzas and a concluding couplet. The form is often named after Shakespeare not because he was the first to write in this form but because he became its most famous practitioner. It has the rhyme scheme 'abab,cdcd,efef,gg'. The division of three quatrains and a final concluding couplets offered him greater amount of variety with regard to rhyme and theme than is usually found in its Italian predecessors. All his sonnets typically use iambic pentameter, a ten syllable line where the first syllable is unstressed and the second syllable is stressed.

Love was the most dominant theme of the sonnet during the Elizabethan age,but later practitioners such as John Donne and John Milton used the form to write on a variety of subjects , and ever since then the sonnet has been used for diverse subjects . Except for a lapse in the English Neoclassical Period , the sonnet has remained a popular form to the present day and includes among its distinguished practitioners , in the Nineteenth Century , Wordsworth , Shelley , Keats , Elizabeth Barrett Browning , Christina Rossetti , Dante Gabriel Rossetti , and in the twentieth century , Edwin Arlington Robinson , Edua St. Vincent Millay, W.B. Yeats , Robert Frost , W.H.Auden and Dylan Thomas. The stanza is just long enough to permit a fairly complex lyric development , yet so short and so exigent in its rhymes as to pose a standing challenge to the ingenuity and artistry of the poet.

Following Petrarch's early example , a number of Elizabethan authors arranged their poems into Sonnet Sequences , or Sonnet Cycles , in which a series of sonnets are linked together by exploring the varied aspects of a relationship that constitutes a kind of implicit plot. Shakespeare ordered his sonnets in a sequence , as did Sidney in Astrophel and Stella(1580) and Spenser in Amoretti(1595). Later examples of the sonnet sequence on various subjects are Words worth's The River Duddon , D.G. Rossetti's House of Life , Elizabeth Barrett Browning's Sonnet's from The Portuguese and the American poet William Ellery Leonard's Two Lives. Dylan Thomas' Altarwise by Owl-Light(1936) is a sequence of ten sonnets which are abstruse meditations on the poet's own life. George Meredith's Modern Love(1862) , which concerns a bitterly unhappy marriage , is sometimes called a sonnet sequence , even though its component poems consist not of fourteen but of sixteen lines.

The sonnet, a poetic form with origins in 13th-century Italy, continues to have a significant impact on modern world literature. Despite its historical roots, the sonnet remains a dynamic and versatile form that has adapted to contemporary themes and sensibilities, maintaining its relevance and influence across diverse literary landscapes.

One of the primary impacts of the sonnet in modern literature is its ability to condense complex emotions and ideas into a tightly structured format. The traditional sonnet form, typically comprising 14 lines with a specific rhyme scheme and meter, challenges poets to express profound thoughts concisely and elegantly. This constraint often leads to heightened creativity, as poets experiment with language and form to fit their ideas within the sonnet's boundaries. Contemporary poets have embraced this challenge, using the sonnet to explore themes ranging from personal identity and love to social justice and political commentary. This adaptability has ensured the sonnet's continued relevance in a rapidly changing world.

Moreover, the sonnet's enduring appeal lies in its structural versatility. While the classic Shakespearean and Petrarchan sonnet forms remain popular, modern poets frequently manipulate these traditional structures to suit their expressive needs. Variations such as the "curtal sonnet" or the "sonnet sequence" allow for innovative approaches that can address contemporary issues in fresh ways. This flexibility enables poets to honor the sonnet's rich heritage while simultaneously pushing the boundaries of the form. For example, contemporary poet Terrance Hayes' "American Sonnets for My Past and Future Assassin" employs the sonnet form to engage with themes of race, identity, and history in America, demonstrating how the sonnet can serve as a powerful vehicle for modern discourse.

The sonnet's impact is also evident in its cross-cultural adoption and adaptation. Originally an Italian invention, the sonnet has been embraced by poets worldwide, each bringing their unique cultural perspectives to the form. This global embrace has enriched the sonnet, infusing it with diverse voices and experiences. In India, for instance, poets like A.K. Ramanujan have used the sonnet to bridge Western literary traditions with Indian themes and sensibilities, creating a hybrid form that speaks to a broader audience. Similarly, the African sonnet tradition has seen poets like Dennis Brutus use the form to address issues of apartheid and social justice, demonstrating the sonnet's capacity to resonate within different cultural contexts.

Furthermore, the sonnet has influenced other literary forms and genres. Its emphasis on brevity and precision can be seen in the rise of micro-poetry and the popularity of the short story, both of which demand similar conciseness and impact. The sonnet's legacy of structured creativity has inspired writers across genres to experiment with form and content, leading to innovative literary works that blend tradition with modernity.It continues to be a vital and influential form in modern world literature. Its ability to condense complex emotions, adapt to contemporary themes, and embrace cross-cultural perspectives has ensured its enduring relevance. As poets and writers continue to experiment with and reinvent the sonnet, this timeless form will undoubtedly remain a cornerstone of literary expression, bridging the past and present while providing a framework for future innovations in literature.

Thus, it is clear that sonnets are often technical 'exercises' , but it by no means follows that they are , therefore , insincere . In exploring the medium , poets are exploring their own capacities to feel and think : Sidney's declaration (Astrophel and Stella) , " I am no pick-purse of author's wit" has an ironic edge , but it is justified in the emotional thoroughness of his ex proportions. The uncompromising technical discipline of the sonnet combined with the logical and emotional intensity has preserved its fascination for many poets right down to the present day.

ছৌনাচ ও দু এক কথা

রিয়া সেখ (শিক্ষা বিজ্ঞান)

ছৌনাচ এর উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকদের বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ছৌনাচ বর্তমান ঝাড়খন্ড আধিবাসীদের নাচ, ক্রমে তা পুরুলিয়ার জনজাতি জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। রুদ্রদেব শিবের পার্বন উপলক্ষে মুলতঃ চৈত্র সংক্রান্তিতে এই নাচ সংগঠিত হতো। বর্তমানেও যা অব্যাহত আছে তবে ইদানিংকালে বর্ষা এবং শরৎ ঋতুবাদে প্রায় সব ঋতুতেই এই নাচের প্রাধান্য দেখা যায়।

জন্মলগ্নে ছৌনাচ ছিল খুবই সাদামাটা নাচ। শোনা যায়, তখন নাকি শিল্পীরা খালি গায়ে নৃত্যের মাধ্যমে নটরাজ শিবকে সন্তুষ্ট করতেন। বলাবাহুল্য, এই ছৌনাচ আজকের মতো এত ব্যয়বহুল এবং জাঁকজমক পূর্ণ ছিল না বললেই চলে। আসলে তখন নৃত্য প্রদর্শনটায় ছিল মুলকথা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আজকে সে বিশ্ববিখ্যাত ছৌনাচ আপনারা দেখছেন, এটা কিন্তু একদিনের ফসল মোটেই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিখ্যাত শিল্পীদের সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া, এই ছৌনাচকে প্রথম যিনি সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন তিনি হলেন প্রবাদ প্রতিম শিল্পী মধুরায়। জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কিন্তু পুরুলিয়ার বাইরে প্রথম ছৌনাচ প্রদর্শন করেছিলেন, ১৯৫৩ সালে কলকাতার রাজভবনে 'স্টারস্ অব ইন্ডিয়া' থেকে রাজভবনে ছৌনাচ পরিবেশনের সময় কালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিজের সামনে জয়পুরে রাজা রাজর্ষি রঘুনন্দকে বসিয়ে নাচ দেখেছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী মধুরায়ের দল রাজভবনে নৃত্য পরিবেশন করায় জয়পুরের রাজা রাজর্ষি রঘুনন্দকে চিঠি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। শুধু জয়পুর রাজা রাজর্ষি নন, শিল্পী মধুরায় (দলপতি) এবং তাঁর সহশিল্পীরাও রাজ্যপালের কাছ থেকে যথেষ্ট বাহবা পেয়েছিলেন। আবার, শিল্পী মধুরায়ের যে সক পালাগুলি বিখ্যাত ছিল সেগুলি হল কিরাত অর্জুন, বালী দুন্দুভি, শিকারী নৃত্য, কালী হনুমান যুদ্ধ ইত্যাদি। ক্রমে তা গম্ভীর সিং মুড়া, নেপাল মাহাত, জয়রাম মাহাত, রামনাথ কুমার, প্রভৃদাস কুমার, কলেবর মাহাত, সূর্যকান্ত সহিস, দূর্যোধন মাহাত, হেম মাহাত, বাঘাম্বর সিংমুড়া, গিয়া সুদ্দিন আনসারী, সুখেন ডাক্তার, সুফল মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত, ভগবান দাস প্রমুখদের হাত ধরে রচিত হয় ছৌনাচের স্বর্ণযুগ। শুধু পুরুলিয়া বা পশ্চিমবঙ্গই নয়, ছৌনাচের সুর, তাল আকৃষ্ট করেছিল বিশ্ববাসীকেও। তারই প্রমান স্বরূপ গম্ভীর সিংমুড়ার হাত ধরে ছৌনাচের বিদেশ যাত্রা। তিনি ছৌনাচের মাদকতা দিয়ে দর্শকবৃন্দকে মনমুগ্ধ করেছিলেন। ফলস্বরূপ ভারত সরকার ছৌনাচে তাঁর কৃতিত্বের অবদানরূপে 'পদ্মশ্রী পুরস্কারে' ভূষিত করেন। সেই থেকে ছৌনাচের প্রকৃত বিজয়যাত্রা শুরু।

পরবর্তীকালে শুরু হয় ছৌনাচে আধুনিকতার ছোঁয়া। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার পরিবর্তে সুরকার, গায়ক নিয়োগ, ডিগবাজির প্রচলন, জাঁকজমক পূর্ণ পোশাক এবং সুদৃশ্য মুখোশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে আধুনিকতা আরও বেশী প্রকটভাবে ছৌনাচে অঙ্গীভূত হয়েছে, বিশেষ করে বাদ্যযন্ত্রে, পোষাক পরিচ্ছেদে এবং আলোর উপস্থাপনায়।

ইদানিং ছৌনাচ সম্পর্কে শিল্পীরা উন্নত থেকে উন্নততর রূপ দিতে গিয়ে যে সব কলাকৌশল অবলম্বন করছেন তাতে আমার মনে হয়, এটা হয়ত একদিন মানুষকে ছৌনাচের আসল স্বাদের জায়গা থেকে না বঞ্চিত করে ফেলে! বর্তমানে অত্যাধিক পরিমানে ডিগবাজি, ঘুঙুরের নিষ্ক্রিয়তা, মুখোশের বিকৃত রূপ, যেন সার্কাসে রূপান্তর। ছৌনাচের উন্নতরূপ সবাই দেখতে চায়। কারন মানুষের মধ্যেই আধুনিকতার রঙ লেগে আছে। তবে সেটা যেন মূল ধারাকে ছাপিয়ে না যায়। আধুনিকতার রূপকে পৌরানিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আদাবনা ছৌনৃত্য পার্টির দলপতি তথা পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী নেপাল মাহাত তার বাদনা

পরবের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও শিল্পী বাঘাম্বরের কিরাত পালা, জয়রাম মাহাত-র অষ্টসখীর পালা (নলকূশী) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ছৌনাচে শিল্পীরা তাঁদের দক্ষতা, মাধুর্যতা ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলে চলেছেন।

ইতিমধ্যে ছৌনাচ যেভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করছে, তাতে কিন্তু সরকারী সহযোগিতার একটা ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। তবে এটা যেন ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এই কামনা করি। কারন, অন্ততঃ আমার মনে হয়ে ছৌনাচে কোন একজন দলপতি যতসংখ্যক শিল্পী নিয়ে কঠোর পরিশ্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে যে পালাগুলি প্রদর্শন করে থাকেন, সেই হারে শিল্পীদের মজুরীর জায়গাটা কোথায় যেন দূর্বল। যদিও এখানে উল্লেখ্য যে, 'ছৌনাচ' শব্দটি যেমন একদিকে পুরুলিয়া জেলাকে টেনে নিয়ে আসে বিশ্ব সাংস্কৃতিক মানচিত্রে তেমনি আবার বর্তমান প্রজন্মের নিরুৎসাহের ছবিটাও পরিষ্কার করে দেয়। সে যাইহোক, শিল্পীদের রক্ত যতদিন প্রজন্মের শিরা ধমনিতে প্রবাহিত হবে ততদিন পুরুলিয়ার বুকে ছৌনাচও অক্ষুন্ন থাকবে।

বিশেষ রচনা

মহান বিপ্লবী শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত

নেহা খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

এই পৃথিবীতে মানুষের যে ইতিহাস তা তার জীবনের ব্যবহারিক সাফল্য লাভে নয়, এমন কি সে যেসব সাম্রাজ্য গড়েছে ও ভেঙেছে তার মধ্যেও পাওয়া যাবে না মানুষের যথার্থ পরিচয়। যুগ থেকে যুগান্তরে সত্য এবং সততার সন্ধানে মানবাত্মার যে বিকাশ পরিলক্ষিত হয় তার-ই মধ্যে আছে মানুষের প্রকৃত পরিচয়। আত্মশক্তির এই অভিযানে যাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন, একমাত্র তাঁরাই সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি স্থায়ীস্থান লাভ করেন। মহাকালের হাতে শূর- বীরদের লাঞ্ছনা অনিবার্য এবং অবধারিত-কালের সকলের বিস্মৃতি সুনিশ্চিত। এর একমাত্র ব্যতিক্রম সাধু সন্তজন - তাঁরা কখনো বিস্মৃত বা বিলুপ্ত হন না। তাঁরা চিরজীবী। আমাদের কালে মহাত্মা গান্ধীর যে মহত্ত্ব, তার মূলে ছিল তাঁর পবিত্র জীবন-যাপন-প্রণালী; তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম নয়। তিনি জোর দিতেন কেবলমাত্র আত্মার সৃজনী- শক্তির ওপর। যখন বিধ্বংসী শক্তিসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্কটকালে আত্মশক্তির এই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখেছিলেন তিনি।

১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শেষ বারের মত ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্বে ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। একথা সত্যি যে কংগ্রেসই কিছু পরিমাণে জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে দিয়েছিল আমাদের জাতীয় চেতনা। কিন্তু এই জাগরণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং গান্ধীই একে গণজাগরণে পরিণত করেছিলেন-যা ভারতবর্ষে আগে কখনো দেখা যায়নি। এমন সব বিষয় নিয়ে তিনি কাজ সুরু করেছিলেন যেগুলি নিছক রাজনৈতিক ছিল না, তবে ভারতের বিরাট জনজীবনকে তা স্পর্শ করেছিল। চম্পারণ ও খয়ড়াতে সাফল্য মণ্ডিত।

সত্যাগ্রহ ছিল এর দুটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ভারতের জনসাধারণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তোলা এবং তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করাই তাঁর বড় কৃতিত্ব নয়। তিনি এমন ভাবে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। আমার বিবেচনায় ভারতের রাজনীতিতে এবং পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতির কাছে তাঁর সর্বোত্তম অবদান হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অসামান্য পদ্ধতি। তিনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন কেমন করে অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই পরাক্রমশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভব হতে পারে। ভারতবাসীকে ও পৃথিবীর মানুষকে তিনি দিয়েছিলেন যুদ্ধের পরিবর্তে একটি নৈতিক বিকল্প। তিনি রাজনীতিকে অন্যায় এবং কপটতার স্তর থেকে উদ্ধার করেছেন। সত্য এবং অহিংসা-পৃথিবীর মুক্তির জন্য এই হলো মহাত্মা গান্ধীর শ্রেষ্ঠ অবদান। এরই মধ্যে আভাসিত হয়েছে আত্মশক্তির জয়।

শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত সারাজীবন ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একজন প্রকৃত অনুগামী। তাঁর জীবনও আত্মশক্তির জয়ের আর-একটি দৃষ্টান্ত। যে দেশ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাসাগরের জন্ম দিয়েছে, সেই মেদিনীপুরের সন্তান তিনি। তিনি একাধারে একজন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অন্য দিকে গান্ধী প্রদর্শিত সত্য ও অহিংসা-নীতির পূজারী। কোমলে কঠিনে একটি নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ সতীশচন্দ্র দেশাত্মবোধে দীক্ষালাভ করেছিলেন তরুণ বয়সেই। তাঁর সময়কার প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ছিলেন, তাঁর দীক্ষাগুরু। গান্ধী যেমন রাজনীতির পাঠগ্রহণ করেছিলেন তিলক ও গোখেলের কাছে, সতীশচন্দ্র ঠিক তাই করেছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের চরণপ্রান্তে, যখন স্বামীজি

মহিষাদলে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। যেদিন থেকে এই দুটি আত্মা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল, আমরা কল্পনা করতে পারি, তখন যে জ্যোতির্ময় অগ্নিশিখার উদ্ভব হয়েছিল তা নিশ্চয়ই রাঙিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের দিগন্ত- এমন ঘটনা সচরাচর দুর্লভ। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর নিজস্ব ছাঁচে গড়েছিলেন তাঁর তরুণ শিষ্যের জীবন-একজন নিবেদিত-প্রাণ

জনসেবক ও একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অহিংসানীতি দ্বারাও গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবন এবং তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যুগান্তকারী অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি। তখন তিনি বহুবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল যখন ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের উত্তাল সময়ে সতীশচন্দ্র তাঁর সারাজীবনের বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ ও একনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়ার সহযোগিতায় তমলুকে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে শ্রীসামন্ত এই স্বাধীন সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বৃটিশ সৈন্য ও স্থানীয় পুলিশবাহিনীর অকল্পিত অত্যাচার সত্ত্বেও এই স্বাধীন সরকার পুরো দু'বছর তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। তারপর কংগ্রেস-নীতির পরিবর্তনের কালে যখন তাম্রলিপ্ত সরকার অবলুপ্ত হয়, তখন সতীশচন্দ্র এক নতুন মূর্তিতে আমাদের সামনে দেখা দিলেন- সংসদের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে। যে ত্রিশ বৎসর কাল তিনি লোকসভায় ছিলেন সেই সময়ে তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বাগ্মীতার দরুণ তিনি সার্বজনীন সম্মান ও প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে দিল্লীতে অবস্থানকালে যে-কেউ সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনিই তাঁর সরল জীবন-যাত্রা দেখে যারপর-নাই মুগ্ধ হতেন।

প্রাত্যহিক জীবনে, আচার-আচরণে, পোশাক পরিচ্ছদে সতীশ- চন্দ্রের সরলতা সকলকেই মুগ্ধ করেছে এবং তাঁকে একটি প্রবাদ-পুরুষে পরিণত করেছে। যতদিন তিনি সক্রিয় রাজনীতির মধ্যে ছিলেন তিনি কখনো উচ্চাসনে বসেননি, তাঁর নেতৃত্বের প্রকৃত মহত্ত্ব এইখানেই। এইরকম একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি, যাঁর ভিতর ও বাহিরের স্বচ্ছতা একই রকম, মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন-এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মুখ্যত সতীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এবং ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়ে

মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখবার জন্য গান্ধীজী মেদিনীপুরে এসেছিলেন। সতীশ চন্দ্রকে দেখেই তাঁর প্রত্যয় হয়েছিল যে, মেদিনীপুরের এই নেতাটি যেন মূর্তিমান নৈতিক শক্তি। এসবই তাঁর জীবনের বহুশ্রুত বিষয় এবং সেগুলির পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। কোনো মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা নির্দ্বিধায় সতীশচন্দ্র সামন্তকে গান্ধীজীর 'সেন্ট পল' বলতে পারি-সেন্ট পল যেমন যীশু- খৃস্টের একান্ত অন্তরঙ্গ অনুগামী ছিলেন, সতীশচন্দ্র ঠিক তাই ছিলেন -মহাত্মা গান্ধীর একজন একান্ত অন্তরঙ্গ অনুগামী।

এইভাবেই মেদিনীপুরের এই সহজ সরল এবং দেশহিতে-নিবেদিত প্রাণ মানুষটির জীবন আমাদের কাছে আত্মশক্তির জয়লাভের একটি ভাস্বর দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত হয়। এই জীবন আমাদের সকলের পক্ষে, বিশেষ করে তরুণদের, অনুসরণযোগ্য। আজ যখন রাজনীতির দুদিন, রাজনীতি যখন অভিসন্ধিপরায়ণদের পণ্য হয়ে উঠেছে এবং আমাদের চারদিকে যখন অবক্ষয়ের অশুভ পরিবেষ্টন, তখন সতীশ চন্দ্রের মতন মানুষেরাই আমাদের পথ প্রদর্শক হতে পারেন-সত্য এবং প্রেমের-পথে। রাজনীতি অর্থহীন হবে যদি তার মধ্যে সত্য ও প্রেম না থাকে।

বিপ্লবী কবি

সুহানা খাতুন (ইতিহাস)

বিপ্লবী বাংলার অগ্নিহোত্রী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি চঞ্চল, দুর্বার। তিনি বিদ্রোহী। কালবৈশাখীর ঝড়, তিনিই ধূমকেতু। সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। বিদ্রোহী নজরুলের হাতে রণতূর্য, তিনিই জীবন যুদ্ধের অগ্নিবীণা।

কবির জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়া জেলায়। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা। দারিদ্র্য তাঁকে গ্রাস করে। স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই সেনাবাহিনীতে যোগদান। এরপর করাচি থেকে ফিরে এসে কাব্য চর্চায় মন দেন। ইংরেজ সরকার তাঁর কাব্যে অগ্নিঝরা বিদ্রোহের ডাক শুনে শঙ্কিত হয়। কবিকে কারারুদ্ধ হতে হয়। তাঁর বহু কবিতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কবির উল্লেখ যোগ্য কাব্যগ্রন্থ অগ্নি বীণা, বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা, সিন্ধু হিল্লোল সর্বহারা, ছায়ানটা। শিশু সাহিত্যেও তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর ভোর হল দোর খোল, খুকুমণি ওঠো র'-শিশু বয়সের জাগরণ গীতি। জীবন ও সূর্যের অভিন্ন সাদৃশ্যে জীবনের মর্মবাণী কানে বাজে । ফরিয়াদ বা সাম্য বাদী কবিতায় মানুষের শোষণ, পীড়নের হাত থেকে মুক্তির আহানে ধ্বনিত। মানব জীবন ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে। জাতপাতের উর্দ্ধে। সাধারণ মানব জীবনেই যে অসাধারণের ব্যঞ্জনা- এ সত্য নজরুল প্রচার করেছেন। তাঁর বীররস পূর্ণ রুদ্রভাবের কবিতার বিস্ফোরণে কিছুকাল স্বয়ং কবি গুরু ও ম্লান হয়ে যান। বিদ্রোহী বা ঝামাল পাশা কবিতায় বীরত্বের অপরাজেয় অভ্রভেদী ছবি।"আমি চির বিদ্রোহী বীরআমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শিরা।" বন্দী দশা থেকে প্রত্যাশিত মুক্তির জন্যই তিনি গেয়েছেন ভাঙার গান— কারার ঐ লৌহ কপাট,ভেঙে ফেল কররে লোপাট।কবি চির নবীনের, যৌবনের কবি। নব যৌবনের বন্দনা করে বলেছেন—"নব নবীনের গাহিয়া গান,সজীব করিব মহা শ্মশান ।অসহায় মানুষের হয়ে কবি ন্যায়াধীশ ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও মিলনে বিশ্বাসী নজরুল স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের কান্ডারীর প্রতি কর্তব্য নির্দেশ করেছিলেন- "কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার'। আবার গীতিকার নজরুলের হাতে বাঁশারি । ফুলে ও ফসলে, কাদা-মাটি জলে তাঁর চোখে পল্লী জননী অপরূপ রূপে প্রতিভাত হয়। প্রেমের গজল গান ও তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। কবির ভাষা ও ছন্দ জ্ঞান তুলনা হীন। আরবি, উর্দুর সাথে সংস্কৃত ও দেশীয় শব্দ ছন্দের নানা বৈচিত্র্যের আমদানী করেছিলেন তাঁর সৃষ্টিতে।নজরুল শুধু বাংলার নয়, ভারতের ও গোটা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মুখপাত্র। ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগষ্ট মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল মূক হয়েছিলেন কবি। কিন্তু সংগ্রামী মানুষের মুখে মুখে, বিপ্লবী জনগণের বুকে বুকে মুখরিত হবে নজরুলের কবিতা।অন্নদা শঙ্কর রায়ের প্রার্থনা ছিল--"ভাগ হয়ে গেছে বিলকুল আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছেভাগ হয়নি কো নজরুল।

তুলসী পাতার ঔষধি গুণ

সিমরন খাতুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)

তুলসী অর্থ- যার তুলনা নেই। ইংরেজিতে Holy Basil বৈজ্ঞানিক নাম Ocimumtenuiflorum, তুলসীর আদি বাসস্থান ভারতীয় উপমহাদেশ হলেও ক্রমে তা সাউথ ইস্ট-এশিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ট্রপিকাল কান্ট্রিতে ছড়িয়ে পড়ে। অসামান্য ঔষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ তুলসী বহু প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সুপরিচিত। বর্তমানে তুলসী নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর এমন অনেক অজানা তথ্য পাওয়া গেছে যা নিঃসন্দেহে তুলসীর মাথার গৌরব মুকুটে নতুন নতুন পালক যোগ করেছে।

তুলসী পাতার পুষ্টিমূল্য (প্রতি ১০০ গ্রাম)

শক্তিমাত্রা:২৩ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ২.৬৫ গ্রাম, প্রোটিন ৩.১৫ গ্রাম, ফ্যাট ০.৬৪ গ্রাম, ডায়েটারি ফাইবার ১.৬ গ্রাম, ফোলেট ৬৮, নায়াসিন ০.৯০২ মিগ্রা, ভিটামিন-এ-৫২৭৫ আই.ইউ, ভিটামিন সি-১৮ মিগ্রা, ভিটামিন কে-৪১৪.৮, এছাড়াও তুলসীপাতায় আছে কিছু পরিমাণ ভিটামিন B1, B2, ভিটামিন B3, ভিটামিন-ই ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন।

মিনারেল:তুলসীপাতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে পটাশিয়াম ২৯৫
মিগ্রা, ক্যালশিয়াম ১৭৭ মিগ্রা, কপার ৩৮৫ মিগ্রা, আয়রন ৩.১৭ মিগ্রা, ম্যাগনেশিয়াম ৬৪ মিগ্রা, ম্যাঙ্গানিজ ১.১৫ মিগ্রা এবং জিঙ্ক ০.৮১ মিগ্রা।

ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস:ভূমিসীপাতার অসামান্য ঔষধি গুণাগুণের উৎস এতে উপস্থিত বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যালস এবং এসেনশিয়াল অয়েল। যেমন বিটা ক্যারোটিন, বিটা ক্রিপ্টো জ্যানথিন, লিউটিন, জি-জ্যানথিন, ক্যামফিন, ইউগেনল, সিনিওল ইত্যাদি।

বহু রোগের দাওয়াই ঔষধি গুণ সম্পন্ন তুলসীপাতা

ইনফ্লুয়েঞ্জা-সর্দি-কাশি-গলাব্যথা:প্রাথমিক অবস্থায় সর্দি-কাশি গলা ব্যথার উপশমে ঘরোয়া দাওয়াই হিসেবে তুলসীপাতার ব্যবহার বহু প্রাচীন। এক্ষেত্রে গরম জলে কয়েকটা তুলসীপাতা দিয়ে আদা, মধু, গোলমরিচ সহ পান করলে অবশ্যই উপকার হবে। তুলসীর বিশেষ অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি থাকায় ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরেও দারুণ উপকারী।

ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যাজমা:ক্রনিক হোক বা অ্যাকিউট- এক্ষেত্রে তুলসীপাতার বিশেষ রোগ নিরাময়ী ক্ষমতা আছে। তুলসীপাতার ইউগেনল, সিনিওল ইত্যাদি এসেনশিয়াল অয়েল এবং ভিটামিন 'সি' রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ও ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ দূর করে। এমনকি টিউবারকিউলোসিস ও লাং ক্যানসার প্রতিরোধেও তুলসীপাতার বিশেষ ভূমিকা আছে। ধূমপায়ীরা নিতান্তই ধূমপান ছাড়তে না
পারলে রোজ অন্তত গোটা ৫/৬ তুলসীপাতা খান।

হার্টডিজিজ:রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল LDL মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে তুলসীপাতা। তুলসীপাতা পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় রক্তের উচ্চচাপ কমিয়ে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্তচলাচল স্বাভাবিক রাখে এবং হৃদরোগ প্রতিরোধ করে।

মাউথ ফ্রেশনার:তুলসীপাতা ওরাল ডিসিইনফেকট্যান্ট হিসেবে কাজ করে। দেখা গেছে তুলসীপাতা মুখগহ্বরের প্রায় ৯৯ শতাংশ জীবাণু নষ্ট করতে সক্ষম। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ দূর করা ছাড়াও ওরাল-ক্যান্সারের আশঙ্কা কমায় তুলসীপাতা।

আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট

পারুলি খাতুন (ইতিহাস)

বিশ্ব বিখ্যাত গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম অলিম্পিয়া। বাল্যকালে প্রথমে লিওনিদোস নামে এক ব্যক্তির কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরে সু-প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হন। গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' পড়তে আলেকজাণ্ডার ভালোবাসতেন। যেখানেই যেতেন সুদৃশ্য বাক্সে করে 'ইলিয়াড' নিয়ে যেতেন। গ্রীক বীর আকিলিসের বীরত্ব কাহিনী তাঁকে মুগ্ধ করত। রাজা ২য় ফিলিপের মৃত্যুর পর ৩৩৬ খ্রীঃ পূঃ মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি ম্যাসিডনের রাজা হন। অল্পকাল পরেই অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। তারপর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সমস্ত পৃথিবীতে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করে বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ৩৩০ খ্রীঃ পূঃ পারস্য সম্রাট ৩য় দরায়ুসকে পরাজিত করে, রাজধানী পার্সিপোলিস ধ্বংস করেন। মিশর জয় করে সেখানে আলেকজান্দ্রিয় নগরী স্থাপন করেন । ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। এই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ছিল। গান্ধার, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল ২৮টি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি ছিল রাজতন্ত্রী, কতকগুলি প্রজাতন্ত্রী। রাজতন্ত্রী দেশ অশ্বক, পুষ্কলাবতী, তক্ষশীলা আর বিতস্তা নদীর তীরে পুরুর রাজ্য। প্রজাতন্ত্রী মৌগানিকই, কথোই, শিবি, মল্ল, ক্ষুদ্রক দেশগুলি কলহে লিপ্ত থাকত। আলেক জাণ্ডার যখন পারস্যে তখন তক্ষশীলার রাজা অম্ভি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অধীশ্বর পুরুর শক্তি খর্ব করার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলেকজাণ্ডার সাহায্যে সম্মত হন । অম্ভিকে সাহায্য করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। সিন্ধু নদের তীরে এসে তারা পুষ্কলাবতীর অষ্টক রাজের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ত্রিশ দিন যুদ্ধের পর অষ্টক রাজকে নিহত করে তারা সেখানে আলেকজাণ্ডারের অপেক্ষা করে। ২য় দল নিয়ে আলেকজাণ্ডার কাবুল নদীর উত্তর তীরের পার্বত্য জাতির সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সকলকে পরাজিত করে ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ সিন্ধু তীরে পূর্ববর্তী দলের সঙ্গে মিলিত হন। তক্ষশীলায় উপস্থিত হলে রাজা অম্ভি বিরাট দরবারে তাঁকে উপঢৌকন দেন। কিন্তু বিতস্তা ও চন্দ্রাভাগা নদীর মধ্যবর্তী ভূ- ভাগের অধীশ্বর পুরু তার অধীনতা স্বীকার করতে অসম্মত হন। তিনি ৩০ হাজার পদাতিক, ৪ হাজার অশ্বারোহী, বহু রথ ও রণহস্তী নিয়ে ঝিলমের তীরে আলেকজাণ্ডারের পথ অবরোধ করেন। ফলে যুদ্ধ বাধে। পুরু অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েও পরাজিত হন। আত্মসমর্পণ করেন। এই যুদ্ধ হিদাসপিস বা ঝিলমের যুদ্ধ নামে খ্যাত। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার তার কাছে জানতে চান পুরু তার কাছে কি রকম ব্যবহার আশা করে ? পুরু বীরত্ব পূর্ণ কণ্ঠে জানিয়ে দেন রাজার মত। পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার তার রাজ্য ফিরিয়ে দেন। বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ কিছু পার্শ্ববর্তী রাজ্যও দেন। আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল মগধের নন্দ সাম্রাজ্য আক্রমন করার। রণক্লান্ত গ্রীক সৈন্য আর অগ্রসর হতে চায়নি। ফলে বিপাশা নদীর তীর থেকে তিনি স্বদেশে ফিরতে বাধ্য হন । ভারত ত্যাগের পূর্বে তিনি পূরুকে বিতস্তা আর বিপাশার মধ্যবর্তী ভূভাগ এবং অম্ভিকে বিতস্তার পশ্চিমে তাঁর অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের ভার দেন। তিনি এরপর নদীপথে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার পথে সিন্ধুদেশ জয় করেন। সিন্ধুর তীরের যুদ্ধ প্রিয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে তার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে মালব, ক্ষুদ্রক, অগলসয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তারপর বহু রাজ্য অতিক্রম করে তিনি সিন্ধুতীরের পতন নগরীতে উপস্থিত হন। এখান থেকে দুইভাগে ভাগ হয় তাঁর সৈন্যদল।

হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে এসে আলেকজাণ্ডার সৈন্যবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম দলটি বালুচিস্তানের মধ্য দিয়ে পারস্যের দিকে যাত্রা করে। অপরদল আলেকজাণ্ডারের অধীনে করাচীর কাছে ভারত ত্যাগ করে সমুদ্র

তীর ধরে ব্যাবিলনের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে পৌঁছানোর ১ বছর পর মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরই আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য প্রধান সেনাপতিরা ভাগ করে নেয়।

আলেকজাণ্ডার সম্বন্ধে নানা প্রচলিত গল্প ইউরোপীয় সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। যে সকল লেখকগণ তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের বর্ণনা অনুসারে, পরবর্তীযুগের গ্রীক ও রোমক লেখকেরা তাঁর অভিযানের সত্যিকারের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এর নিদর্শন পাওয়া যায় আরিয়ান, জাস্টিন, প্লুতার্ক, রুফোস প্রমুখের রচনায় । পাশাপাশি অনেক গাল-গল্পের সূচনাও হয়েছিল। এই ধরণের লেখার সূত্রপাত করেন মিশরবাসী এক গ্রীক, আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষে আসা সত্ত্বেও কোনো ভারতীয় কাহিনীতে তাঁর ক্ষীণতম উল্লেখ নাই। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ ইচ্ছা সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। প্রাণঘাতী রোগে তিনি শয্যা নিলেন। মৃত্যুর ছায়া ঘনালো তাঁর শিয়রে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পারলেন-পরাক্রম, শৌর্য, ধন সম্পদের অসারতা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব। সেনাপতিকে বললেন- ম্যাসিডোনিয়ায় আমার হয়তো ফেরা হবে না, আমার তিনটে ইচ্ছা আছে তোমরা পালন করো। এক) - আমার শব-বাহী কফিন যেন আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরাই বহন করে। দুই) - যে পথে আমার মৃতদেহ যাবে, সে পথে আমার অর্জিত সব সম্পদ মণি-মাণিক্য সোনা দিয়ে ঢেকে দেবে। তিন) - আমার মৃতদেহ কফিনে শায়িত থাকলেও হাত-দুটি কফিনের বাইরে দু-দিকে থাকবে। শোকাকুল একজন সেনাপতি আবেগে বিনয়ে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। আলেকজাণ্ডার বললেন – মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু সত্য। কোনো চিকিৎসক মৃত্যুকে পরাজিত করতে বা অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ যেন তা বুঝতে পারে। ধন সম্পদে মুড়ে দেওয়া রাস্তা আমার গৌরবের চিহ্ন নয়। মানুষ জানুক একটা কপর্দকও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। হাত দুটি বাইরে ঝুলিয়ে রাখার অর্থ - লোকে জানবে, আমি শূন্য হাতে এসেছিলাম পৃথিবীতে, যাচ্ছিও তাই। এই জন্যই তিনি আলেকজাণ্ডার, দি গ্রেট।

আমাজন

রহিনা খাতুন (বাংলা)

আমাজনের কথা প্রথম যখন শুনি তখন আমি অনেক ছোট। সেই থেকে স্বপ্নে ছবি আঁকি। আমার কল্পনায় আমাজন এক গহীন অরণ্য। দুর্ভেদ্য। যেখানে গাছের পাতা ভেদ করে সূর্যা লোকের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে বিচিত্র সব পশু-পাখি-পতঙ্গকুল।যারা সংখ্যায় অজস্র। সে জঙ্গলে কেউ একবার ঢুকে পড়লে, পথ হারানো নিশ্চিত। অতিকায় হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় টার্জানের মত মানুষরা। জঙ্গলের ফল-মূল আর নদীর মাছ খেয়ে চলে জীবন। তারা রক্ষা করে এই জঙ্গলকে জলদস্যুদের হাত থেকে। এই বর্ষাবনে নাকি সঞ্চিত আছে বিপুল রত্নসম্ভার। ছোট বেলাকার কৌতূহল তো, অনেক জিজ্ঞাসা, তার মধ্যে একটা ছিল, কত বড় এই অরণ্য? তখন আমি ছয়-সাত। বাবা মার সাথে সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। চারদিন ছিলাম। দু-বেলা নৌকা চেপে ঘুরেও জঙ্গলের অনেকটা নাকি দেখাই হয়নি। আমার ধারণায় তখন এর চাইতে বড় জঙ্গল আর হতেই পারে না। আমাজন যত বড়ই হোক, তাকে ছাড়াতে পারে না কোনোমতেই পারে না।তারপর বড় হয়ে দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে যা সামনে এল, তাতে তো আমি ভেবেই অবাক! আমাজনের বর্ষাবনেই নাকি ঠাঁই হতে পারে বাষট্টিটা পশ্চিমবঙ্গের। অববাহিকা অঞ্চল ধরলে আরও বেশী। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তবে ভেঙেই বলি। একেবারে অঙ্কে। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। সে জায়গায় আমাজন বর্ষাবনের ৫,৫০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অববাহিকা অঞ্চল ধরলে ৭,০০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

আমাজনের এই অরণ্যে দুটো ঋতু। বেশী বর্ষা আর কম বর্ষা। বিশাল এই জঙ্গলের ভেতরে রয়েছে নটা দেশের অংশ- ব্রাজিল, পেরু, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, গায়ানা, ফ্রেঞ্চ গায়ানা আর সুরিনাম। এর ভেতর ব্রাজিলের ষাট শতাংশ। তার পরই পেরু-তেরো শতাংশ। কলম্বিয়া-দশ শতাংশ, বাকি দেশেদের অংশ থাকলেও তেমন উল্লেখ করবার মত নয়। আমাজন নদী, তার দু-পাশে দিগন্ত বিস্তৃত এই জঙ্গল। বছরের বেশীটা সময়ই বৃষ্টি। শুধুমাত্র আগস্ট আর সেপ্টেম্বরে কম বর্ষা। গড় তাপমাত্রা ২১-৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সারা দক্ষিণ আমেরিকার চল্লিশ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এই বৃষ্টি অরণ্য। সাজানো ষোলো হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি দিয়ে। লতা থেকে গুল্ম-বৃক্ষ-ছত্রাক কত যে রকম আছে তার ঠিক নেই।

এমন গাছ, যা অন্য কোথাও মেলে না- Amazon cedar, Brazil nut শুধুমাত্র এখানকারই। এখানকার বন আলো করে থাকে Mahagony, Rose Wood, Palm, Laurel, Giant Water Lily, Passion Flower, রঙ-বেরঙের Orchid বা coffe plant। সিন্থেটিক রবার আবিষ্কারের আগে এ জঙ্গলে চলত গাছ থেকে রবার সংগ্রহ। অন্যান্য গাছ কেটে তৈরি হচ্ছিল রবার বাগিচা। পৃথিবীতে মেলা এবং আবিষ্কৃত প্রতি দশটা জীব প্রজাতির একটার ঠিকানা আমাজন। পাঁচটার ভেতর একটা পাখি থাকে এই আমাজনে আমাজনে পাওয়া যায় ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রায় ১৩০০ প্রজাতির পাখি, ৩৭৮ প্রজাতির সরিসৃপ, ৪০০ প্রজাতির উভচর, ২৫,০০০০০ (পঁচিশ লক্ষ) প্রজাতির কীট- পতঙ্গ, এছাড়া নদীতে মেলে প্রায় ২,২০০ প্রজাতির মাছ। এখানে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বাঁদর- পিগমি মারমোসেট, Gold- Lion-Tamarin(সিংহ-মুখো বাঁদর), Sloth, Bald Uakari, তীব্র চীৎকার করা Howlar Monkey, South American Tapir, Jaguar, Armadillo, Vampire Bat, Giant Ant - eater, পাখিদের মধ্যে অনন্য Scarlet Macaw, Toucan, Harpy Eagle, Black Caiman, উভচরদের মধ্যে বিশিষ্ট Poison Dart Frog, Giant Leaf frog, সরিসৃপদের ভেতর সাড়া জাগানো Anaconda, Green Lizard, Jesus Lizard,

Green Iguana আর জলে চলে Giant otter, Amazonian Manatee, Amazon River Dolphin থেকে Electriceel।Electric eel। আমাজনের এই বর্ষা-বন প্রায় পঞ্চাশটি আদিবাসী -গোষ্ঠীর দু-কোটি মানুষের বাস। এদের অনেকেরই জানা নেই জঙ্গ লের বাইরের পৃথিবীটা কেমন। এই জঙ্গলই ওদের অন্নদাতা-ওদের আশ্রয়। সারা পৃথিবীর মোট বর্ষাবনের অর্ধেকটাই আমাজনের ভাগে। সেখানে গাছের ঘনত্ব এতটাই যে গাছের মাথায় বৃষ্টি পড়লে তা চুঁইয়ে মাটিতে নামতে প্রায় দশ মিনিট সময় লাগে। গাছেদের ভেতর শিম্বজাতীয় (Leguminous) গাছের আধিক্য। এসব গাছের ফল প্রোটিনে ভরপুর। পুষ্টি যোগায় বনের পশু-পাখি থেকে আদিবাসী-সব্বাইকে। এছাড়া এ জঙ্গলে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের ঔষধি গাছ Medicinal Plant। প্রচুর পরিমাণে।

এ জঙ্গলের জান আমাজন নদী ও তার শাখা-উপশাখা। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়, আবার শ্বসনের ভেতর দিয়ে গাছেরাও জল ছাড়ে বাতাসে। এই জলীয় বাষ্প ওপরে উঠে তৈরি করে জল ভরা মেঘ। গাছেদের মাথায় ধাক্কা লেগে আবার নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে। নিয়ন্ত্রণে থাকে তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীদের হিসেবে আমাজন বর্ষা-বনের মাটিতে জমা আছে ৯,০০০ থেকে ১৪,০০০ কোটি টন কার্বন। দাবানলের ধাক্কায় এই কার্বন যদি কার্বন ডাই অক্সাইডে পাল্টে যায়, সঙ্গে বাতাসে দেখা দেয় কার্বন-মনোক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস, তাহলে ছবিটা যে কী হবে চিন্তাই করা যায় না। এর সাথে জুড়তে হবে আরও একটা জরুরি কথা-সারা পৃথিবীর অরণ্য যত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে তার বিশ শতাংশই দেহে ধারণ করে এই বৃষ্টি বন। এজন্য এ বনের আর এক নাম Natural Sink। Global warming নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাই এ বনের গুরুত্ব এত। অসাধারণ এই বৃষ্টিবনের ইকো-সিস্টেম বা বাস্তু-তন্ত্র এতটাই উঁচু তারে বাঁধা যে, সামান্যতম বদলেও ঘটে যেতে পারে বড় বিপর্যয়। মাত্র তিন ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেই ৭৫ শতাংশ খতম হয়ে যেতে পারে এই আমাজন বৃষ্টি বন।

আমাজন পৃথিবীর ফুসফুস, মানুষের শেষ আশ্রয়।একথা জানেন সবাই। সব দেশ। দুনিয়ার মোট অক্সিজেনের পাঁচ ভাগের এক ভাগই আসে এই বৃষ্টি-বন থেকে, অথচ তাকেই জ্বালিয়ে শ্মশান বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাজন বৃষ্টি বনের বেশিটাই ব্রাজিলে। গত কয়েক দশক ধরে লুঠ-পাট সেখানেই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে প্রায় আট লক্ষ বর্গকিলোমিটার । প্রতিবাদ হয়েছে দেশের ভেতরে, দেশের বাইরে। চেকো মেন্দেসের মত পরিবেশবিদকে প্রাণ দিতে হয়েছে নিজেরই দেশে লুঠেরাদের হাতে। বর্তমান পরিস্থিতি প্রায় হাতের বাইরে।আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই অক্সিজেন ভাণ্ডারকে বাঁচিয়ে রাখা।

ঘুটিয়ারী শরীফের ১৭ই শ্রাবণের ইতিহাস

বিলকিস পারভিন (বাংলা)

মোবারক গাজীর অবদানের সাথে ঘুটিয়ারি শরিফের ইতিহাস জড়িত। তিনি হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) এর আর্দশ নমুনা হিসাবে নিজেকে মানব জাতির জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর মাধ্যমে এই জেলার প্রতিটি মানুষ উপকৃত। তাই তিনি সবার নিকট 'গাজী সাহেব' নামে খ্যাত। তাঁর মাজার বাঁশড়া ঘুটিয়ারী শরীফ। তাঁরজন্ম-মৃত্যু সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের ঘটনা সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সত্য বেরিয়ে আসে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭) তাঁর রাজত্বের শেষ লগ্নে বাংলায় তাঁর সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলি ইনি আরঙ্গজেবের খুব অনুগত অফিসার ছিলেন। আওরঙ্গজেবের শেষ জীবনে অর্থের টানাটানির কথা ঐতিহাসিকরা লিখেছেন। বাংলা সুবা থেকে এক কোটি টাকা রাজস্ব মুর্শিদকুলি খাঁন পাঠিয়েছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁন তখন বাংলার সুবাদার। তিনি প্রতিটি জমিদারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বকেয়া খাজনা আদায় করার হুকুম জারি করলেন। সেদিন খাজনা শোধ না করলে জমিদারি বাতিল হবে। আদি গঙ্গার তীরে তখন মদনমল্ল রায় (কায়স্থ) জমিদার। তাঁর মোটা টাকা খাজনা বাকি। টাকা সংগ্রহের কোন পথ নেই। ফলে তাঁর জমিদারি চলে যাবেই। তাঁর একজন কর্মচারী যার নাম ছিল আব্দুল লতীফ। তিনি জমিদারকে জানালেন কুড়ালি ছয়ানী এলাকায় একজন আল্লাহর ওলি রয়েছেন, তাঁর কাছে যাওয়া যাক। যেমন কথা, তেমনই কাজ। উভয়ে মোবারক গাজী সাহেবের নিকটে এসে সব কিছু জানালেন এবং খুব কাকুতি মিনতি করলেন। বারুইপুরে শাসনের পুরাতন বাজার যা জমিদারদের নামে চৌধুরী বাজার বলে প্রসিদ্ধ। সেই সময়ের জমিদার মদন রায় এবং তাঁর কর্মচারী, আব্দুল লতীফ সাহেব। গাজী সাহেব জমিদারকে জানালেন, আপনার নিকট যা টাকা আছে সব নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঢাকায় রাজ দরবারে পৌঁছে যান। বাকি কি করা যায় আমি দেখছি। গাজী সাহেব আল্লার প্রশংসা এবং নবীর উপর দরুদ পাঠ করে গভীর রাত্রে জমিদারের সমস্যাটি আল্লাহর কাছে পেশ করলেন এবং জমিদারী রক্ষা যাতে হয় তার জন্য পীর সাহেব আল্লাহর থেকে ওয়াদা পেয়ে গেলেন। ওদিকে ঢাকার অফিসে এক এক জন জমিদারের নাম এবং খাজনার পরিমান প্রকাশ হতে লাগলো। যখন মদন রায়ের নাম উঠলো এবং ঘোষিত বাকি খাজনা জানানো হল। তখন মদন রায় খুশিতে টগবগে হয়ে ট্রেজারীতে গিয়ে যে খাজনা তার বাকি ছিল, আর ঐ দিনে যে বাকি ঘোষণা হয়েছিল, তা মূল বাকির একটা সামান্য অংশ মাত্র শোধ করেদিলেন জমিদারি রক্ষা হয়ে গেল। দক্ষিণ ২৪ পরগণা সম্প্রীতির জেলা তা প্রমান হয়ে গেল। যাহা হউক, জমিদার মদন রায় সেই সময় গাজী সাহেবের কাছে আর্জি রাখলেন । আপনি আল্লাহর কাছে দোওয়া চান বৃষ্টির জন্য, না হলে আমরা বাঁচবো কি করে ? গাজী সাহেবের দোওয়ায় ১৭ই শ্রাবণ অবিশ্রাম বৃষ্টি হল। মাঠ জলে ডুবে গেল। চাষিরা আনন্দে চাষ করতে শুরু করলো।

"চা"-উৎপাদনের ইতিহাস

মিয়াসবিন খাতুন (বাংলা)

চা আমরা কম বেশি সবাই খাই। কিন্তু আমরা কি জানি ভারতে এই চা কোথা থেকে আসল! বা এর উৎপত্তির ইতিহাস কি !চলুন এই নিয়ে দু চার কথা আলোচনা করা যাক।

চা এর উৎপত্তি নিয়ে কথিত আছে প্রায় পাঁচশত খ্রিস্টাব্দকালীন সময়ে দীর্ঘ নয় বৎসর পর্বত গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর হঠাৎ ধ্যানভগ্ন হওয়ার বিরক্তিতে নিজের চোখের পাতা ছিঁড়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এবং সেই অংশ থেকে সৃষ্ট হয় এক গাছ , যার পাতা থেকে তৈরি হয় এমন এক পানীয় যা তাঁর শিষ্যদের মন ও স্নায়ু শান্ত ও সজাগ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও ওই পানীয়বিশেষ প্রচলনের অপর একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও আছে। আজ থেকে প্রায় ৪৭০০ বছর আগে চিনদেশীয় এক রাজা পথের পরিশ্রম লাঘব করতে কোনও এক গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর তাঁর জন্য পানীয় জল গরম করা হচ্ছিল কাছেই, ঘটনাক্রমে ওই গাছের পাতা পড়লো জলে, কর্মীরা ভুলবশত সেই জলই পান করতে দিল রাজাকে। তিনি ছিলেন আবার ভেষজ বিদায় পারদর্শী, কর্মীদের সে ভুল আন্দাজ করতে পারলেও, তাদের তিরস্কার তো করলেনই না, বরং মনে ধরল সে অদ্ভুত পানীয়। ঠিক করলেন, এই পানীয় তিনি নিয়মিত পান করবেন। বলা বাহুল্য সেই থেকেই প্রচলিত হল চা। এসব গল্পকথা আর গল্পের সত্যাসত্য যাচাই এর উর্ধ্বে গিয়ে আজ জলের পরে চা-ই পৃথিবীর সর্বাধিক জনপ্রিয় পানীয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে মানুষ অন্তত ২০০ কোটি কাপ চা পান করে থাকে। মেজাজ চাঙ্গা করার পাশাপাশি যার ঔষধি গুণেরও তুলনা মেলা জন্য ভার।

স্বভাবতই গল্পের চা গাছের বিবরণ বৃক্ষরূপী হলেও তা বর্তমানের পাহাড় পর্বতের কোলে শোভা পাওয়া সুদৃশ্য, চিরহরিৎ বাগানের বেঁটেখাটো উচ্চতার চা গাছগুলোর সাথে মেলে না।

আসলে মজার ব্যাপার এই যে, এ দুটো পাতা ও একটি কুঁড়ি তোলার সুবিধার জন্যই নির্দিষ্ট সময়ান্তর বাগানের চা গাছগুলোকে কেটে ছেঁটে অমন ছোট করে রাখা হয়, নয়তো আপন নিয়মে এই ছোট ঝোপগাছই বৃক্ষরূপ ধারণ করতে পারে। এমনকি চীনের ইউনান প্রদেশে এমন বড় ও গুঁড়িবিশিষ্ট চা গাছ দেখতেও পাওয়া যায়। উল্লেখ্য এক একটি চা গাছ দীর্ঘদিন বাঁচে এবং আমাদের দেশেই কিছু বাগানের চা গাছ একশো বছরেরও বেশি পুরোনো।

যদিও প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এদেশে চা পানের কথা এবং ষোড়শ শতকে রসুন-তেল সহযোগে চা পাতা রান্না হওয়ার কথা শোনা যায়, তথাপি বানিজ্যিকভাবে ভারতবর্ষে চা চাষের প্রচলন মুলত ব্রিটিশ আমলেই। সেটি ১৭৫০-এর সময়কার কথা। চীন থেকে বছর বছর কয়েক লক্ষ পাউন্ড চা রপ্তানি করা হত ইংল্যান্ডে। ক্রমে তা চূড়ান্ত ব্যায়বহুল হতে থাকায়, ব্রিটিশরা ঠিক করেন তাঁদের তৎকালীন উপনিবেশ ভারত-এ চা-এর উৎপাদন শুরু করার কথা। সেইমতো বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নির্দেশে চীন থেকে চায়ের বীজ আনিয়ে এদেশে লাগানোর ব্যবস্থা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। এমনকি ১৭৮০ সালে কর্নেল রবার্ট কিড হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ যেটি বর্তমানে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন) পরীক্ষামূলক ভাবে চা-এর বীজ থেকে চারা তৈরি করার চেষ্টাে করে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীকালে ১৮২৩-এ এক স্কটিশ প্রকৃতিবিদ রবার্ট ব্রুস আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কিছু দেশীয় চা গাছ খুঁজে পান। লন রবার্ট এই গাছগুলির সঠিক পরিচিতিকরণের আগেই মারা গেলে, তাঁর ভাই চার্লস ব্রুস ১৮৩৪-এর ক্রিস্টমাস-এ ওই গাছের কিছু ভাল নমুনা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ পাঠান। অতঃপর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-এ জানা যায় সেটি চাইনিজ চা গাছের থেকে সামান্য ভিন্নধর্মী অপর প্রকারের চা গাছ। সেই থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে উৎপাদিত মূলত সমস্ত চা-

এর উৎস এই দুই প্রকারের গাছ।কিছুটা ছোট পাতা বিশিষ্ট চায়না জাতীয় (Camellia sinensis var sinensis), যা শীতল পরিবেশে পাহাড়ি এলাকায় বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত এবং তুলনামূলক বড় পাতার আসাম জাতীয় (Camellia sinensis var assamica) যেটি উষ্ণ আবহাওয়া এবং সমতল জমিতে বেড়ে উঠতে সক্ষম। ব্রিটিশরা বুঝেছিলেন, আসাম চা চায়না প্রকারের থেকে কিছুটা নিম্নমানের। কিন্তু, যখন দেখা যায় চায়না জাতীয় গাছগুলো তাঁদের নির্ধারিত আসামের সমতল জমি ও উষ্ণ আবহাওয়াতে বাঁচাতে অক্ষম, তখন সেখানে আসাম চা-ই রোপণের ব্যবস্থা করা হয়। আর সেই উৎপাদিত প্রথম আসাম চা ১৮৩৮ সালের শেষের দিকে লন্ডন পাড়ি দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একই কারণে ১৮৩৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দার্জিলিং- এর পাহাড়ে চা বাগান তৈরির সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে চায়না জাতীয় গাছগুলি লাগানো হয়, কারণ সেটিই ওই পরিবেশের জন্য আদর্শ।

সিল্ক রূটের মাধ্যমে চীন থেকে তিব্বত প্রদেশে আসা প্রায় ২০০০ বছর আগের বাণিজ্য সামগ্রীর মধ্যে চা-এর নিদর্শন মিলেছে। অতি সম্প্রতি চীনদেশীয় গবেষকমহল দাবী করেছেন, সমস্ত প্রকারের চা গাছের জন্মস্থল ও আদি বাসস্থান চীনেই এবং সেখান থেকে পণ্য সরবরাহের সময়েই কোনো সময় ভারতে আসে চা গাছ এবং আসাম চায়েরও অস্তিত্ব তা থেকেই। তবে তা গবেষণাসাপেক্ষ।

ধর্ম, রাজনীতি ও বিজ্ঞান:-
একটি সুষম সমাজ গঠনের জন্য

Miraj Ahamed Sardar
Bengali

ধর্ম, শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে প্রথমে আসে উপাসনা, প্রার্থনা, এবং কিছু রীতি-নীতি। কিন্তু ধর্মের অর্থ কি শুধুই আচার-অনুষ্ঠান? না, ধর্ম তার চেয়েও অনেক বড়। ধর্ম আমাদের জীবনকে গড়ার মূল ভিত্তি। ধর্মীয় জ্ঞান সেই আলো, যা আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সঠিক পথ দেখায়।

একজন মানুষ যখন ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, তখন তার জীবনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সে বুঝতে পারে না, কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো এই সুযোগ নেয়। তারা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মনের মধ্যে বিভেদ এবং হিংসার বীজ বপন করে। ধর্মীয় জ্ঞান যদি সবার মধ্যে থাকত, তবে মানুষ সহজেই বুঝতে পারত, রাজনীতি আসলে মানুষের সেবার জন্য। কিন্তু এখন দেখা যায়, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে রাজনীতি অনেক সময় সমাজে হিংসা আর বিভেদ তৈরি করে।

ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য কেন জরুরি? কারণ, এটি আমাদের জীবনকে গভীর অর্থ দেয়। ধর্ম মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। আমাদের শেখায়, কীভাবে একে অপরকে সম্মান করতে হয়। সমাজে যখন সবাই একে অপরকে শ্রদ্ধা করবে, সহানুভূতি দেখাবে, তখনই একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে।

ধর্মীয় জ্ঞান শুধু নৈতিকতার ভিত্তি নয়, এটি বিজ্ঞানের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। মানুষ যখন সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভাবতে শুরু করে, তখন বিজ্ঞান তার উত্তর খোঁজে। ধর্ম আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায়, প্রশ্ন করতে শেখায়, এবং গবেষণার দিকে উৎসাহিত করে। ধর্ম বলে, “জ্ঞান অর্জন করো, কারণ জ্ঞানই সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে বড় দান।” বিজ্ঞান ঠিক সেই কাজটাই করে–জ্ঞান অর্জন।

ইতিহাস সাক্ষী, ধর্মীয় জ্ঞানের ভিত্তিতেই বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরআনের

1.(সূরা "আল ইমরান" আয়াত নম্বর ১৯০)"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"” তখন তা মানুষকে গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

২. মানব ভ্রূণ বিকাশ (Embryology)

কোরআনে বলা হয়েছে:

"আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে শুক্রকীটের (নুটফাহ) একটি বিন্দুতে পরিণত করেছি। তারপর তাকে আলাকাহ (রক্তপিণ্ড বা ঝুলন্ত বস্তু) বানিয়েছি। তারপর মুদগাহ (চর্বির মতো বস্তু) সৃষ্টি করেছি। তারপর হাড় তৈরি করেছি এবং হাড়ে মাংস পরিয়েছি।" (সুরা আল-মুমিনুন, ২৩:১২-১৪)

ড. কিথ মুর, একজন প্রখ্যাত মানব ভ্রূণতত্ত্ববিদ, উল্লেখ করেছেন যে এই বিবরণ আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা শুধু অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝা সম্ভব। সনাতন ধর্মের বেদ,পূরণের তথ্য অনুযায়ী-

১. ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি (The Creation of the Universe)

বেদে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্ব:

"নাসাদাসীন্ ন সাদাসীন্ তদানি। নাসীদ্রজো নব্যোমা পরো যৎ।" (ঋগ্বেদ ১০.১২৯.১)

ঋগ্বেদের এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আগে কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটি আধুনিক "বিগ ব্যাং তত্ত্বের" সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে বলা হয় যে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল একটি অদৃশ্য বিন্দু থেকে।

২. ব্রহ্মাণ্ডের চক্রাকার প্রকৃতি (Cyclic Universe) হিন্দু দর্শনে সময়কে চক্রাকার (Cyclic) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মার একটি দিনকে "কল্প" বলা হয়, যা ৪.৩২ বিলিয়ন বছর দীর্ঘ। এই দিন শেষে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয় এবং পুনরায় সৃষ্টি হয়। "কল্পের পর কল্প মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয় এবং ধ্বংস হয়।" (ব্রহ্ম পুরাণ)

আধুনিক বিজ্ঞানেও কিছু তত্ত্ব রয়েছে, যেমন "Oscillating Universe Theory," যা বা সাবিশ্ব সৃষ্টি এবং ধ্বংসের চক্রে আবর্তিত হয়।

খ্রিষ্টান ধর্মের বাইবেল এর তথ্য অনুযায়ী

১. পৃথিবীর আকৃতি (Shape of the Earth)

বাইবেলে বলা হয়েছে: "তিনি পৃথিবীকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন।" (চাকরি 26:7) এখানে বলা হয়েছে যে পৃথিবী শূন্যে ঝুলে আছে, যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সঠিক। এছাড়া, "তিনি পৃথিবীর বৃত্তের উপরে বসেন।" (ইসাইয়া ৪০:২২) এই আয়াতে পৃথিবীকে "বৃত্ত" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা পৃথিবীর গোলাকার প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

২. ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির শুরু (The Beginning of the Universe)

বাইবেলে বলা হয়েছে: "আরম্ভে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।" (আদিপুস্তক ১:১)

বিজ্ঞান বলেছে যে মহাবি ব্যাং তত্ত্ব), যা বাইবেলের টি নির্দিষ্ট শুরু ছিল (বিগ এর সঙ্গে মিলে যায়।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি যদি নৈতিকতার ভিত্তি না পায়, তবে তা বিভ্রান্তি এবং ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা রাজনীতিকে সৎ রাখে, ন্যায়পরায়ণ হতে শেখায়। মহাত্মা গান্ধী ধর্মীয় নীতির মাধ্যমে রাজনীতির পথে হাঁটেন। তার অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের শিক্ষাই মানুষকে স্বাধীনতার পথে নিয়ে গেছে। আবার ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যাবে ইসলাম ধর্মের বহু নবীগণ এমন কি ইসলামের শেষ পথপ্রদর্শক মহানবী হযরত মোহাম্মদ(সঃ) বহু রাষ্ট্র শাসন করে দেখিয়েছেন কিভাবে ধর্মের মিলবন্ধন রাজনীতি করলে ন্যায়পরায়ন হবে এমন কি বিভিন্ন ধর্মের বাণী অনুযায়ী বিজ্ঞান ও রাজনীতির সম্পর্ক দেখা যায় ইসলাম ধর্মের বাণী-

১. ইসলামের শাসনব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন যে, তোমরা আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দাও যারা তার হকদার এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায়ের ভিত্তিতে কর।"

(সুরা আন-নিসা, ৪:৫৮)

এই আয়াতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী রাজনীতিতে শাসকের প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

২. শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা (Consultation)

"তাদের কাজকর্ম পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।" (সুরা আশ-শুরা, ৪২:৩৮)

ইসলামী রাজনীতিতে পরামর্শ বা শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন। এটি গণতন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সনাতন ধর্মের বাণী

১. শাসক ও প্রজার সম্পর্ক

মনুস্মৃতি-তে বলা হয়েছে:

"রাজা হলেন দেবতাদের প্রতিনিধি, এবং তার প্রধান কর্তব্য হলো প্রজাদের সুখ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা।"

(মনুস্মৃতি ৭.২)

এতে রাজাকে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার দায়িত্ব হলো প্রজাদের সুখ নিশ্চিত করা।

২. শূরা বা পরামর্শ ভিত্তিক শাসন

মহাভারত-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে শাসকরা পরামর্শদাতা বা মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা করতেন।

"যে রাজা জ্ঞানী পুরোহিত এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নেয়, সে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।"

(মহাভারত, শান্তি পর্ব, ৫৮:৪)

এটি শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক উপাদান এবং পরামর্শ ভিত্তিক শাসনের গুরুত্ব বোঝায়।

খ্রিষ্টান ধর্মের বাণী অনুযায়ী

১. শাসকের দায়িত্ব ঈশ্বর থেকে নির্ধারিত

বাইবেল বলে যে শাসক বা শাসন ব্যবস্থা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত:

"প্রত্যেক ব্যক্তি শাসনকর্তৃপক্ষের অধীনে থাকুক। কারণ কোনো কর্তৃপক্ষই ঈশ্বরের কাছ থেকে ছাড়া আসে না। যে কর্তৃপক্ষ আছে, তা ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।"

(রোমীয় ১৩:১)

এটি বোঝায় যে শাসন ব্যবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছার অংশ, এবং শাসককে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

শাসকদের প্রতি বাইবেলের নির্দেশ:

"তুমি ন্যায্যতার বিচার করবে, আর দরিদ্র ও নিপীড়িতদের রক্ষা করবে।"

(সাং Proverbs ৩১:৮-৯)

শাসকদের দায়িত্ব হলো জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্বলদের রক্ষা করা।

উপরে সংক্ষেপ আলোচনায় দেখলাম কিভাবে সব ধর্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতির সঠিক শিক্ষা দিয়েছে তাই ধর্ম, বিজ্ঞান, এবং রাজনীতি–তিনটি ক্ষেত্রই যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে সমাজে উন্নতি হবে। কিন্তু এই তিনটি ক্ষেত্রের মেলবন্ধন তখনই সম্ভব, যখন ধর্ম, বিজ্ঞান, এবং রাজনীতি একত্রে কাজ করে, তখন তারা একে অপরের ঘাটতি পূরণ করে। ধর্ম মানবিক ও নৈতিক দিক নির্দেশনা দেয়, বিজ্ঞান বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করে, আর রাজনীতি এই সমাধানগুলো বাস্তবায়ন করে। এই সমন্বয় একটি প্রগতিশীল, শান্তিপূর্ণ, এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ পায় এবং আলোর দিকে এগিয়ে যায়।

ধর্মীয় জ্ঞান আমাদের শেখায়, আমরা সবাই এক। সৃষ্টিকর্তার তৈরি এই পৃথিবী সবার জন্য। ধর্মীয় শিক্ষা যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকতে পারে, তবে সমাজে আর কোনো বিভেদ থাকবে না। বিজ্ঞান আরও উন্নত হবে, রাজনীতি মানুষের কল্যাণে কাজ করবে, আর আমরা পাব একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ।

বর্তমান ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতে ধর্ম, বিজ্ঞান, এবং রাজনীতি একত্রে কাজ করলে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ধর্ম মানুষের নৈতিকতা, সহমর্মিতা, এবং সহনশীলতার শিক্ষা দেয়, যা সমাজে একতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ধর্মীয় নেতাদের উচিত হবে কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন দূর করতে উদ্যোগী হওয়া এবং মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের দিকে পরিচালিত করা।

বিজ্ঞান দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। প্রযুক্তি, গবেষণা, এবং শিক্ষার প্রসারে বিজ্ঞান নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, উন্নত চিকিৎসা, পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবন ভারতের অর্থনীতিকে

শক্তিশালী করবে। বিজ্ঞান মানুষকে যুক্তিবাদী চিন্তা করতে শিখিয়ে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতে সাহায্য করবে।

রাজনীতি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজে ন্যায়বিচার এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজনীতি এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে, যা বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তিতে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

যখন ধর্ম নৈতিক ভিত্তি দেবে, বিজ্ঞান বাস্তবিক সমাধান দেবে, এবং রাজনীতি এই সমাধানগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে, তখন সমাজে শান্তি, একতা, এবং উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। একসঙ্গে কাজ করলে এ ন্যায়বিচারপূর্ণ, শিক্ষিত, হবে। 'রতবর্ষকে একটি ১ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম

তাই আজ সময় এসেছে ধর্মকে নতুনভাবে বোঝার। ধর্ম শুধু উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আমাদের জীবনের দিশা। ধর্মের প্রকৃত বার্তা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তবে আমাদের জীবন হবে অর্থপূর্ণ এবং সমাজ হবে উন্নত।

"ধর্মের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি জীবন, শান্তিতে ভরে উঠুক এই পৃথিবী।"

ভ্রমণ কাহিনি

সুন্দরবনের ভ্রমন বৃত্তান্ত

অধ্যাপিকা নাসিফা লস্কর
(ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)

‘কলকাতা থেকে গাড়িতে গদখালি পৌঁছে লঞ্চে দু’ঘন্টার পথ পার করলে সুন্দরবনের রিসর্টে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে গদখালি পৌঁছলাম ও দশ মিনিটের মধ্যে এসে গেল আমাদের জলযান। রিসর্টের এক তরুণ তত্ত্বাবধায়ক, মালপত্র সমেত আমাদের লঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নদীর জোলো হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আরাম করে বসলাম।

গদখালির ঠিক উল্টোদিকে হল সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান দ্বীপ গোসাবা। এখানে হাসপাতাল ও পুলিশ স্টেশন ছাড়া হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলো আছে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন যিনি ১৯০৩ সালে তেত্রিশ বছর বয়সী এক অর্থবান স্কটিশ ব্যবসায়ী সুন্দরবনে এসে সরকারের কাছ থেকে ৯০০০ একর জমি কিনে জমিদারী পত্তন করেছিলেন ও সেখানেই বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজের অবহেলিত প্রজাদের উন্নতি সাধন। তিনি গোসাবা, রাঙ্গাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া এই তিনটি দ্বীপের মানুষ নিয়ে তাঁর গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় প্রকল্প শুরু করেন। তাঁর নানা প্রকল্পের মধ্যে একটি ছিল নদীর পাড় বরাবর উঁচু করে বাঁধ দেওয়া। সেইসব কর্মকাণ্ড নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হ্যামিল্টন সাহেবের চিঠিতে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ‘হ্যামিল্টন সাহেবের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে সুন্দরবনে এসেছিলেন। অনেক পর্যটক গোসাবায় সাহেবের বাংলো দেখতে যান। আজও সুন্দরবনের মানুষ সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা করে’।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলনস্থলে যে বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে রয়েছে এই বিখ্যাত জঙ্গল যার নাম সুন্দরবন। সুন্দরবন ভারত ও বাংলাদেশে অবস্থিত UNESCO স্বীকৃত World Heritage Site । সেখানে রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড় বদ্বীপে অবস্থিত লবণাম্বু উদ্ভিদের জঙ্গল বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। জায়গাটির নাম তার জঙ্গলের রূপের জন্য নাকি সেখানে থাকা লবণাম্বু উদ্ভিদ সুঁদরি বা সুন্দরী গাছের নামানুসারে তা সঠিক ভাবে জানা যায়না। বদ্বীপ অঞ্চলটি জুড়ে রয়েছে অজস্র ছোট-বড় নদী ও খাঁড়ি আর তাদের মাঝে মাঝে জেগে আছে কতোগুলো দ্বীপ। সুন্দরবনের মোট ১০,০০০ স্কোয়ার কিমি অঞ্চলের ৫৭৩৬ স্কোয়ার কিমি রয়েছে বাংলাদেশে ও ৪২৬৪ স্কোয়ার কিমি আছে ভারতে। ভারতীয় অংশে ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মনুষ্যবসতি রয়েছে। জলের ধারে রয়েছে নানা ধরণের লবণাম্বু উদ্ভিদের বাস আর ভেতরের জঙ্গলে রয়েছে জলের লবণত্ব ও জমিতে থাকা খনিজ পদার্থের পার্থক্য অনুযায়ী অন্য নানা ধরণের গাছপালা। সেই ঘন জঙ্গলে বাস করে বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার-সহ আরো নানা প্রাণী।

১৯৭৩ সালে ভারত সরকার সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্প শুরু করে। ১৯৮৭ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলকে মধ্যস্থলে রেখে তৈরী হয়েছে সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান।জানা যায় যে পায়ের ছাপ দেখে বাঘ গণনার পুরনো পদ্ধতি খুব সঠিক ছিল না। ২০১০ সালে সুন্দরবনে ৯৬ টি বাঘ ছিল। সম্প্রতি বাঘের অসমর্থিত সংখ্যা হল ১৫০।

সুন্দরবন সত্যি সত্যি বিপদসংকুল জায়গা – তার জলে কুমীর ও ডাঙ্গায় বাঘ। এছাড়া, প্রাণীদের মধ্যে বড় বেড়ালের মতো বাঘরোল, চিতল হরিণ, বাঁদর, গোসাপ, নদীর শুশুক ইত্যাদি রয়েছে। নানাধরণের (বিষাক্ত ও নির্বিষ) সাপ ছাড়া, Olive ridley turtle আর Batagur Basca নামে একরকম কচ্ছপও সেখানে পাওয়া যায়। জঙ্গলে বসবাসকারী কয়েকশ' রকম পাখি ছাড়া পরিযায়ী পাখিও সেখানে আসে।অতি আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে,'জলবায়ুর পরিবর্তনে সমুদ্রের জল বাড়ছে আর তার বদ্বীপ অঞ্চলের জল বেশি লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সুন্দরবনের জঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও অনেক প্রাণী লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে'।প্রথমে আমরা সজনেখালিতে গিয়ে সরকারি দফতর থেকে পারমিট নিলাম ও সেখান থেকে একজন গাইড আমাদের সঙ্গী হলেন। ওখানে Mangrove Interpretation Centre আছে। গাইড আমাদের লবণাম্বু উদ্ভিদ সুঁদরি গাছের বিভিন্ন রকম শ্বাসমূল চেনালেন; ঐ গাছের পাতার নীচটা সাদা। উনি কাঁকড়া গাছও চেনালেন যার বীজ জলে ভেসে থেকে একবছর পরেও অঙ্কুরিত হতে পারে। এছাড়া বাটাগুর কচ্ছপ ও কুমীরের প্রজননের জন্য যে জলাশয় রয়েছে সেগুলো দেখলাম। একটু ঠাণ্ডার সকাল বলে বোধহয় একটা মাত্র কুমীরের শরীরের কিছু অংশ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। প্রচুর বাঁদর সেখানে রাজত্ব করছে।

একটি গ্রামে নদীর পাড়ে পরপর অনেকগুলি নৌকো বাঁধা আছে। এগুলি মূলত জেলেদের নৌকো একটি শৌখিন বোর্ডে দুই শ্বেতাঙ্গ পর্যটক ছিলেন। আবার, বড় এক নৌকোয় এক ভদ্রলোককে দেখলাম লম্বা টেলিফোটো-লেন্স লাগানো ক্যামেরায় চোখ দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছেন – যেন ধ্যান-মগ্ন এক ঋষি।

গাইড অনেক রকম গাছ চেনালেন - সুঁদরি, গেওয়া, গরান ও হেতালের (সরু সরু সবুজ পাতার মধ্যে কতোগুলো হলদে পাতা থাকায় ঐ ঝোপে বাঘের লুকিয়ে থাকা সহজ। আর দেখলাম গোলপাতার গাছ যা বাড়ি ছাওয়ার কাজে লাগে কিন্তু এখন লুপ্ত হতে বসেছে। কোথাও দেখেছি নদীর এক পাড়ে গ্রাম ও অন্যদিকে জঙ্গল। বাঘ বা বন্য জন্তু আটকানোর জন্য জঙ্গলের ধারে ধারে নাইলনের নেট লাগানো রয়েছে যা দুর্যোগের দাপটে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এছাড়া, নদী পাড় ভেঙে জঙ্গলকে গ্রাস করছে যে তেমন চিহ্নও দেখলাম।সেখানে যারা বাস করেন দারিদ্র দুর্দশা তাদের নিত্য সঙ্গী। সাম্প্রতিককালে পরপর সাইক্লোনে অনিশ্চিত হয়েছে দ্বীপবাসীদের ভবিষ্যৎ। আমাদের দুদিনব্যাপী জলে-জঙ্গলে বেড়ানোর সময় যেসব নদী, খাল বা খাড়ি এলো তাদের সবার নাম শুনেছিলাম – বিদ্যাধরী, দুর্গদুয়ানি, সজনেখালি, পীরখালি ইত্যাদি কতো নাম। তবে আমার কাছে তারা সবাই শুধু 'নদী' হয়েই রইল – বড় নদী বা ছোট নদী; কেউ তার বিস্তৃত বক্ষে বহন করে চলেছে বিশাল জলরাশি, কারো বা ক্ষীণতনু তবে তারা সকলেই সুন্দরী। সেই সব নদীর ধারে জঙ্গল রয়েছে, কখনও রয়েছে কোনো গ্রাম আর কখনও অন্য আরেকটি নদী যেন সই পাতাতে এসে আমাদের নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। সবুজের বাহারও বা কতোরকম – চোখ জুড়িয়ে যায় সেই সবুজের বৈচিত্র্য দেখলে। প্রকৃতির এমন রূপ দেখলে স্বভাবতই মুগ্ধ হতে হয়।

বেঙ্গালুরুর ভ্রমণ

বর্নালী প্রামাণিক (তৃতীয় সেমিস্টার)

বেঙ্গালুরু অতিসুন্দর ব্যস্ত জেলা ও শহর। কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী বেঙ্গালুরু। পূর্বে নাম ছিল ব্যাঙ্গালোর বর্তমানে বেঙ্গালুরু। কর্নাটকের উত্তরে মহারাষ্ট্র, দক্ষিণে কেরল ও তামিলনাড়ু, পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমে আরব সাগর। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে কর্ণাটক। কানাড়াভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে ভারতের অষ্টমরাজ্য মহীশূর গঠিত হয়। গাছপালার প্রাচুর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যায়ন, সেই সঙ্গে চমৎকার স্থাপত্যের সংমিশ্রণ খুব কম শহরে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাণ বলে থাকে- মহিষাসুরের নাম থেকে মহীশূর নাম বর্তমান কর্ণাটক। এদেশের ভাষা কন্নড়-এর সংস্কৃত রূপ কর্ণাটক। সংস্কৃত শব্দ কর্ণাটক-জাত কন্নড় = কর+নাড়ু = কালো মাটির দেশ। এই ভাষা বহু প্রাচীন। রামায়ণে আছে-সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা তুঙ্গ ভদ্রা নদীর মাঝে ছিল সেটাই বর্তমানে
হাম্পি বেঙ্গালুরু থেকে ৩৫০ কিমি. দূরে। এই অঞ্চলে প্রস্তর যুগের প্রমাণও পাওয়া যায়।
উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন চললেও এখানে সুদীর্ঘকাল হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেছেন। ১৭৫৮ তে হায়দার আলি এই শহর দখল করে পরে তার পুত্র টিপু-সুলতান গড়ে তোলেন দুর্গ আর শহর বেঙ্গালুরু। তাঁর ভাল কাজ আজও অম্লান হয়ে আছে। পরে ইংরেজদের দখলে আসে, তখনও নাম ছিল মাইসোর বা মহীশূর। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে রাজ্যের নাম করণ হয় কর্ণাটক। এই রাজ্যে সোনার খনি ও চন্দন কাঠের জঙ্গল, নদীর জন্ম কৃষ্ণা, কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা আর ৩২০ কিমি দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বিশেষ আকর্ষণ।
বেঙ্গালুরুকে কর্ণাটকের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। ৯২০ মি. উঁচুতে অবস্থিত বেঙ্গালুরু, এর সাজানো প্ল্যান মাফিক প্রশস্ত রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, পার্ক বিজ্ঞানালয় বিশেষ আকর্ষণের স্থান। জলবায়ুর কথা বললে কলকাতা যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত মানুষ অতিষ্ট তখন বেঙ্গালুরু গ্রীষ্মকাল বলে বোঝা যায় না। সর্ব্বোচ তাপ মাত্রা ৩০ ডিগ্রি. আবার প্রচণ্ড শীতের সময় ১৪ডিগ্রির বেশী কমে না। সারা বছরেই এখানকার জলবায়ু মনোরম। বেঙ্গালুরু নাম নিয়ে একটি কথা প্রচলিত আছে। বিজয়নগরের রাজা বীরবল্লাল রাজ্যপাট সর্বস্বান্ত হয়ে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে মরণাপন্ন অবস্থা। তখন বনে এক বৃদ্ধা তাঁকে সিম সিদ্ধ (বীনস) খেতে দিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। কৃতজ্ঞ রাজা তখন সেই স্থানের নামকরণ করেন বেন্দাকালুরু। শব্দটা উচ্চারণ করা কঠিন। তাই লোকমুখে পরিবর্তন হয়ে বেঙ্গালুরু। বেন্দা-সিদ্ধ, কালু-বিনস্, উরু-শহর = বেঙ্গালুরু।
বেঙ্গালুরু শহরের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির যোগাযোগ অবারিত এবং সুন্দর। পর্যটক ছাড়াও শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা সবসময় এসে থাকেন। এছাড়া বেঙ্গালুরু Hospital গুলিতে উন্নত ধরনের চিকিৎসা যত্ন সহকারে এবং কম খরচে হয়ে থাকে। সেই সুবাদে হাজার হাজার মানুষ ভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশী মানুষ বেঙ্গালুরুতে গিয়ে থাকে।
শহরে দর্শনীয়-লালবাগ-একশত হেক্টর জমির উপর ১৮০০ প্রজাতির গাছপালা দিয়ে এই উদ্যানটি গড়ে উঠেছে। প্রায় হাজার ধরনের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং ঔষধ বৃক্ষের ভাণ্ডারটি সাজানো। দেখার মতো দৃশ্য। এর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কুব্বন পার্ক-এটি ১৫৪ বছরের পুরানো অসাধারণ সুন্দর। এই পার্কটি গড়ে তুলেছিলেন ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কুব্বন। ২৫০ একর জমির উপর। এই জন্য নাম হয় কুব্বন পার্ক। সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ধরনের পসরা উপস্থিত রয়েছে। সাধারণ পাঠাগার, মিউজিয়াম, নাট্য মঞ্চ, বহু প্রাচীন ফসিল (জীবাশ্ম) আর আছে অ্যাকোয়ারিয়াম।
বিধান সৌধ-শহরের অন্য এক আকর্ষণ, স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময় কর নিদর্শন। শহর থেকে ২৮ কিমি. দূরে অবস্থিত ডোড্ড আগাদা সারা, সেখানে তিন একর জমি ঘিরে একটি বটগাছ আছে। আমাদের হাওড়ায় বোটানিক্যাল

গার্ডেনের কথা মনে করিয়ে দেয়। নন্দী হিলস্-৬০ কিমি. দূরে অবস্থিত শৈলাবাস। বানার ঘাট-২২ কিমি. দূরে পাহাড় ঘেরা পর্ণমোচী বৃক্ষের বন বানার ঘাট। ন্যাশনাল পার্ক-১০৪ বর্গ কিমি. অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে জাতীয় উদ্যান। অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। অন্যান্য স্থানগুলি-ইসকন মন্দির, ফান ওয়ার্ল্ড, গান্ধী ভবন, নেহরু প্লানেটোরিয়াম্ প্রভৃতি।

কিভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে দুরন্ত এক্সপ্রেস এছাড়া যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস আরো ট্রেন আছে। বেঙ্গালুরুর প্রধান স্টেশন দুটি-যশবন্তপুর ও বেঙ্গালুরু সিটি জংশন এছাড়াও বেঙ্গালুরু ইস্ট, ক্যান্টনমেন্ট ও কৃষ্ণরাজপুরম। শহর থেকে ৩২ কিমি. উত্তরে বিমানবন্দর, সমস্ত শহরের সঙ্গে যুক্ত।